১লা জানুয়ারী ১৯৮০

পরিবর্তন



কলকাতা চিড়িয়াখানা আকর্ষন হারাচ্ছে



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ সৌম্য ভৌমিক

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


এক-চক্ষু জলদস্যু
মূল কাহিনী ঃ রবিদাস সাহারায়
চিত্র কাহিনী ঃ অলোক দত্ত
শিল্পী ঃ পোলারিস
৭
এখন কি হবে শয়তান
আমায় ক্ষমা কর। আমি হার মানছি।
মিঃ রিচার্ড সাবধান। আপনার পেছনে……
রিচার্ড যেই পেছন ফিরে দেখতে গেলেন শয়তানটা তাকে লক্ষ্য করে ছুরিটা ছুঁড়ে মারল।
ছুরিটা এসে গেঁথে গেল রিচার্ডের পিঠে।
রিচার্ড পড়ে গেলেন।
দস্যুদের সে কি উল্লাস !
ক্রমশঃ

সম্পাদকীয়

নির্বাচনী লড়াই চলবার সময় অনেক কথাই ওঠে, আবার হাওয়ায় মিলিয়েও যায়। যেমন গত নির্বাচনের সময় দেশের বিশাল রাজ্যগুলি ভেঙে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করার একটা কথা উঠেছিল। কোন কোন নেতা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই এমন মনোভাবের প্রতিবাদ করেছিলেন।

সাধারণত বড় একটি দেশে প্রশাসনের সুবিধের জন্যে কয়েকটি অঙ্গরাজ্য তৈরি হয়। এতে আইন ও শৃঙ্খলা স্বাভাবিক ভাবে বজায় রাখার সুবিধে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল বা অসট্রেলিয়ার নাম এই প্রসঙ্গে করা যায়। কিন্তু এসব দেশে বসতি নতুন। তাই অঙ্গরাজ্য ভাগাভাগির সময় প্রশাসনিক সুবিধেটাই দেখা হয়েছিল।

ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের মতো বড় দেশে রাজ্য ভাগাভাগি কিন্তু এরকম কৃত্রিম নয়। এসব দেশে রাজ্য ভাগাভাগি হয়েছে ঐতিহ্য, ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে। অবশ্য ধর্মের দাবি এসেছে পরে।

দুশো বছর ইংরেজ শাসনের পরে এসব আমরা ভুলতে পারি কিন্তু ঘটনা তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না। ইংরেজরা অবশ্য মুসলিম অধিকারের সীমাকে মেনে নিয়েছিল বলেই এই ভুল ঘটেছে।

ভুল ভাঙবার জন্যই ১৯৫৬ সালে কেন্দ্র সরকার রাজ্যগুলি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তখন ঠিক হয় রাজ্যের পুরনো সীমা বদলানো হবে বা নতুন রাজ্য গঠন করা হবে। বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব এই সময়ই হয়েছিল। আবার ভাষার ভিত্তিতে বোমবে প্রভিনসকে ভেঙে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট দুটি রাজ্য বানানো হয়।

তখন বলা হয়েছিল, ভাষার ভিত্তিতেই রাজ্যের পুনর্গঠন হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তা হয়নি। এক হিন্দিভাষী মানুষই তো উত্তর ও পশ্চিম ভারতের চারটি রাজ্যে ভাগ হয়ে আছেন। বাংলাভাষী সাধারণ মানুষও তেমনই সকলে এক রাজ্যের আওতায় আসতে পারেনি।

আবার ভাষাই যে পৃথক রাজ্য গঠনের প্রধান কারণ তা নয়। হরিয়ানা যে পানজাব থেকে বেরিয়ে গেল সে তো তারা শিখ নয় বলেই। উত্তর পূর্ব ভারতে এতগুলি রাজ্যের উদ্ভবের মূলে আবার ভাষা বা ধর্ম কোনটাই কাজ করেনি। সেখানে পৃথক উপজাতি সত্তাই প্রধান ব্যাপার ছিল। গোয়া মারাঠীভাষীদের অঞ্চল। কিন্তু আগের পর্তুগীজ শাসন এখনও তাকে মহারাষ্ট্র থেকে আলাদা করে রেখেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে আমাদের দেশে রাজ্যগুলিকে ছোট বা বড় করা যায় না।

তবে এটাও ঠিক উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশের মতো বৃহৎ রাজ্যগুলি অনেক সময় সারা ভারতের রাজনৈতিক বা সামাজিক রাস্তা ঠিক করে। এটা বন্ধ করা দরকার।

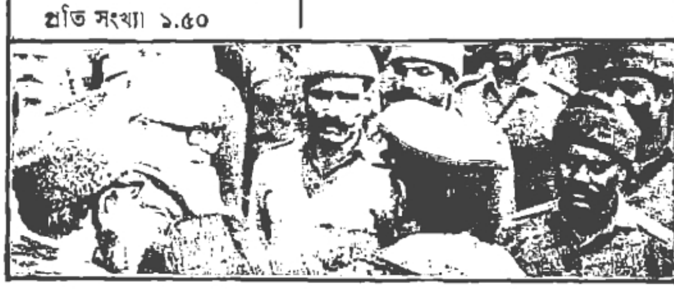
কেমন করে বন্ধ করা যাবে? বড় রাজ্যগুলির একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হবে যদি প্রত্যেকটি রাজ্যের উন্নতিতে সমান সাহায্য ও সমান অধিকার দেওয়া হয়। কেন্দ্র সরকারের সার্বভৌমত্ব তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবার কথা নয়, কারণ মূলনীতি এখনকার মতো ভবিষ্যতেও নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রই।



পরিবর্তন

১ জানুয়ারি ১৯৮০
দ্বিতীয় বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা
প্রতি সংখ্যা ১.৫০

সম্পাদক অশোক চৌধুরী
সংযুক্ত সম্পাদক ধীরেন দেবনাথ
শিল্প-নির্দেশক নিতাই ঘোষ



এই সংখ্যায়

৬/দিললিতে পরবর্তী সরকার বানানোর তৎপরতা/সুদীপ মজুমদার
৮/জ্যোতিষের আলোকে তিন প্রধান/অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
৯/তেহেরান যখন জ্বলছিল/ডাঃ কালীকৃষ্ণ চ্যাটার্জি
১৪/ভারত-তিব্বত সীমান্তে কয়েক ঘণ্টা/অমলেন্দু কুণ্ডু
১৭/ব্যাপক দুর্নীতি কয়লার কালো রঙকেও লজ্জা দেয়/অজয় বিশ্বাস
২৮/জ্যোতিষীর কাছে কারা আসে—কী চায়?/শিবশংকর ভারতী
৩১/এবার যারা অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন/বি কে মুখোপাধ্যায়
৩৩/চিড়িয়াখানা আকর্ষণ হারাচ্ছে?/শ্যামল রায়চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ সিংহ
৩৪/বৃহস্পতিবার ছিল জেনানা ডে/বিশেষ প্রতিনিধি
৩৯/ঘরোয়া/পরিচালনা ঃ নিবারণ চক্রবর্তী
৪১/ভারতের যৌন-রোগীর দশ ভাগের এক ভাগ পশ্চিমবঙ্গে/কামাল হোসেন
৪৫/চৌকিদার দফাদার—সর্বঘটে কাঁঠালি কলা/নিজস্ব প্রতিনিধি
৪৬/কে বড়—গাভাসকর, না বিশ্বনাথ?/শাকাদেব
৪৭/কলকাতার অতিথি—সুকসদ মিহালি/সন্ধানী

২/সমীপেষু	৪/ব্যঙ্গচিত্র	৪/অম্ল-মধুর
৫/দেশে দেশে	১৬/পথ চলতি	২৪/বিশ্ব-বিচিত্রা
২৪/রাজ্যে রাজ্যে	২৪/জেলায় জেলায়	২৫/ওপার বাংলা
২৭/এই পক্ষ	৪০/কমিকস	৪৮/চিত্র-প্রদর্শনী
	৪৮/নাট্য-সমীক্ষা	



প্রচ্ছদ আলোকচিত্র ঃ সোমনাথ চক্রবর্তী

সমীপেষু

বর্ণবৈষম্য

'তপশিলীদের জন্য আসন সংরক্ষণ আর কতকাল' শীর্ষক লেখাটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই। বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা লেখক স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন। অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে ভারতবর্ষে আজ, তাই রাজনৈতিক কুচক্রীর স্বার্থে ন্যায় ও সাম্যের নামে অন্যায় ও বৈষম্যেরই সরব প্রতিষ্ঠা। আজকের এই তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার যুগে সরকারের সীমিত সামর্থ্যের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থে, যে শ্রেণী বর্ণের ভিত্তিতে নির্ধারিত—যদিও আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য জাতি বর্ণ-ভেদহীন সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা।

সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশের শতকরা চল্লিশ শতাংশ অধিবাসীই দারিদ্র্যসীমার নীচে; আর তপশিলী জনগোষ্ঠী সমগ্র জনসংখ্যার কুড়ি শতাংশের বেশি নয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে দারিদ্র্য আর তপশীলত্ব সমার্থক নয়। বরং তপশিলীদের মধ্যেও বহু কোটিপতি, লক্ষপতি, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও উচ্চশিক্ষিত আছে আবার বর্ণহিন্দু-মুসলিম-খৃস্টান প্রভৃতি অ-তপশিলী জনগণের মধ্যে বহু দরিদ্র-সহায়হীন-শিক্ষাহীন মানুষ আছে। আমি নিজে এগারো জন সদস্যের একটি অ-তপশিলী দরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল সদস্য। অর্ধাহার ও অনিশ্চয়তা আমাদের নিত্যসঙ্গী হলেও অ-তপশিলী হওয়ার অপরাধে সরকারী আনুকূল্য থেকে আমরা চিরবঞ্চিত। আমার বেকার ভাই-বোনেরা টাকার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিতে পারে না, অথচ তপশিলী ব্যক্তি কোটিপতির সন্তান হলেও পরীক্ষার ফি তার নামমাত্র। আমার ভাগ্যহত বেকার ভাইবোনদের বঞ্চনার মূল্যে জন্মসূত্রে ভাগ্যবান তপশিলীদের জন্য সরকারী আরামকেদারা সুনিশ্চিত। অ-তপশিলী দরিদ্র জনগণ এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতই অনাদৃত। ধনীর যেমন কোন জাত নেই, গরিবেরও কোনো জাত-ধর্ম-বর্ণ নেই। কিন্তু সরকারী দাক্ষিণ্য বিশেষ বর্ণগোষ্ঠীর জন্য অবারিত, শুধু গরিবের জন্য এদেশে বঞ্চনা-হতাশা ও মৃত্যু সংরক্ষিত।

দিলীপ রায়, কলকাতা-১৪

ফিলম সোসাইটি

কোনও এক ভাস্কর চৌধুরী বিরচিত 'ফিলম সোসাইটিগুলি দর্শকরুচি কতটা পাল্টাতে পেরেছে ?' লেখাটি পড়ে কিছু অজ্ঞানোচিত বিরক্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। ফিলম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সহধর্মিতার কথা পর্যন্ত বলা হয়নি। সে কারণেই লেখাটি অসম্পূর্ণ। দর্শক তৈরি করেন এ দু' ধরনের সংস্থাসমূহই, তবে ভাস্করবাবুর মত ঠিকাদারী কায়দায় সেটি আদপেই সম্ভব নয়।

সিনেমা নিয়ে বেশ গুরুত্ব দিয়ে ভাবেন এমন সকলেরই জানা আছে যে ফিলম সোসাইটি আন্দোলনের ফসল হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত, রাজেন তরফদার, বাসু চ্যাটার্জি, পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবং হালে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শংকর ভট্টাচার্য, সৈকত ভট্টাচার্য, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ, অঞ্জন দাস-এর মতো নবীন প্রতিভাসমূহ। চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান ধারাটি এখন দক্ষিণে প্রবহমান। ভাস্করবাবুর অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি আদুর গোপালকৃষ্ণণ, গিরিশ কারনাড, শ্যাম বেনেগাল, গিরিশ কাসরবাল্লি, বি ভি কারানথ, কর্ণাটকের এম এস সাথ্যু ও আরো অনেক নবীন প্রতিভা উপহার দিয়েছে সিনে ক্লাব আন্দোলন। তাই জাগরণ সম্ভব, আর সেটা এ পথেই। সিনে ক্লাবের মুখপত্রগুলো অনুধাবন করলেই এদের সম্বন্ধে, এদের ছবি সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা ভাস্করবাবুও পেতে পারতেন—চেকোশ্লোভাকিয়ার অমন ছবিটি না ছাপলেও চলত।

'কমিউনিসট দেশের চামচাবাজী' যারা ট্যাকের পয়সা খরচ করে দেখতে চান না, সে সব লোকেদের শ্রেণী চরিত্রের উপমা তারা নিজেরাই—তবু ভাল, এতে করে ভাস্করবাবু স্বীকার করে ফেলেছেন যে অন্তত 'কমিউনিসট' দেশের ছবিতে আনসেনসরড-এর প্রাদুর্ভাব নেই, আমরা কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়াকে সমাজ-তান্ত্রিক দেশ হিসেবেই জানি, আর বিচ্ছিন্ন একটি যৌন দৃশ্য থেকে কিই বা অনুমান করা যায় ?

বিস্তর ফিরিস্তি আছে, মায় কোন সোসাইটিতে কত সদস্য, কবে অ্যাফিলিয়েশন -সব! শুধু নেই কলকাতা থেকে বারো মাইলের মধ্যেই বারাসাত সিনে ক্লাব, খড়দা সিনে ক্লাব, নিউ ব্যারাকপুরের নর্থ চব্বিশ পরগণা ফিলম সোসাইটির উল্লেখ। সে কারণে ক্ষোভ নয়, ক্ষোভ এ জন্যে যে, ফেডারেশনের ঘরে বসে তথ্য নিয়েই যিনি অমন সমঝদারী 'প্রবন্ধ' ফেঁদে ফেলেন তাকে নিয়েই। আমাদের ধারণায়, এ সব ক্লাব-গুলোর কর্মকাণ্ডের খোঁজ পাওয়া অসম্ভব হত না কেন না এই তো সেদিনই খড়দা সিনে ক্লাবের চারদিনব্যাপী বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে শহর কলকাতার থেকে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন—সত্যজিৎ চলচ্চিত্রোৎসবে। গত বছরে আমরা একত্রিশটি কাহিনীচিত্র, সাতটি তথ্য-চিত্র দেখিয়েছি—স্যুভেনির-এ নামগুলো পাওয়া যাবে, ভাস্করবাবু নিশ্চয়ই বিস্ফারিত-নেত্রে শুধোবেন, চেয়ার ভাঙাভাঙি হয়নি? একটাও চেয়ার ভাঙেনি, চেয়ার ভাড়া করতে হয়েছিল।

আর 'সৌখীন কাগুজে আন্দোলন' কাকে বলছেন ভাস্করবাবু? ওর নিজের লেখাটি সম্বন্ধেই ওটি খাটে, নয়ত চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী/ সেমিনার / সভা / হিসেব-নিকেশ / সরকারী যাঁতাকলে নিত্যপিষ্ট হয়েও যারা সোসাইটি-গুলোকে বাঁচিয়ে রাখেন তারা সৌখীন? প্রায় সব সিনে ক্লাবেরই নিজস্ব মুখপত্র আছে—অন্তত কুড়িটি আমরাই জানি, সেগুলো পড়ে দেখতে আবার অনুরোধ করছি আর মনে রাখতে বলছি এসব সোসাইটি বা ফেডারেশনের সংগঠকবৃন্দের কারোরই এটা পেশা নয়। ভাল কিছু করবার মানসিকতাই এদের সংঘবদ্ধ করেছে। অবিমৃষ্যকারিতার জবাবদিহি চাই না, তবু ফেডারেশনের নথিভুক্ত ক্লাবগুলোর উল্লেখেই বেশ বোঝা যায় তথ্য-সংগ্রহের জন্য লেখক ঘোরাঘুরি বিশেষ করেননি। বাজারী কাগজগুলোর ভূমিকা কি ভাস্করবাবু জানেন? 'আনন্দবাজার' এক কলমও ফিলম সোসাইটির খবর ছাপেন না, কারণ ফিলম সোসাইটিগুলি কোন বিজ্ঞাপন দেয় না, আর ফিলম সোসাইটি আন্দোলনে ওদের বিস্তর ক্ষতি। কারণ, ফিলম ব্যবসায় মুনাফাবাজীটাও সোসাইটিগুলোর আক্রমণবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দর্শকরুচি গড়ে তুলবার দায়িত্ব কি কেবলমাত্র ফিলম সোসাইটিগুলিরই? আর কারো কোন দায়ভাগ তাতে নেই? বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সমাজকর্মী, অভিভাবক, যুবসংস্থা, ছাত্রসংস্থা, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, লেখক – সমাজের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে,—তারা সকলেই তাদের করণীয় কাজ-গুলি করছেন তো? দর্শককে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ফিলম সোসাইটি বা গ্রুপ থিয়েটারগুলি শুধু দর্শককে সংঘবদ্ধ হওয়ার নেতৃত্ব দিতে পারেন, সব দায়দায়িত্বের বোঝাই কেবলমাত্র তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

আপনি যা দেখেছেন এ ছাড়াও কিছু আছেই ভাস্করবাবু, না হলে দুনিয়াটা অনেকদিন আগেই 'এ' মেয়েদের ক্লোজ-আপ ছবিতে ভরপুর হয়ে যেত, যা আপনার প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ অকারণেই ব্যবহৃত!

মানস মুখোপাধ্যায়,
সাধারণ সম্পাদক, খড়দা সিনে ক্লাব

॥ ২ ॥

বাংলা চলচ্চিত্রের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটি (১৬ নভেম্বর '৭৯) সুপরিকল্পিত এবং প্রশংসনীয় প্রয়াস। অকুণ্ঠ ধন্যবাদ রইল।

শ্রী ভাস্কর চৌধুরীর ফিলম সোসাইটি সংক্রান্ত নিবন্ধটি চিন্তার খোরাক জোগায়। প্রসঙ্গত, দু-চার কথা বলতে চাইছি।

শহর কলকাতার ব্যস্ত ফিলম সোসাইটি-গুলোর ততোধিক ব্যস্ত এবং অত্যুৎসাহী চলচ্চিত্র রসিকদের অনেকেই প্রকৃতপক্ষে কোন রস আহরণে টগবগ করছেন? ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার সময় বোধহয় এসে গিয়েছে—সমাজতাত্ত্বিকদের তো বটেই।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি: একটি বিখ্যাত ফিলম সোসাইটির সপ্তাহব্যাপী বিদেশী চলচ্চিত্র উৎসবে হঠাৎ কোনো এক শীতের রাতে দেখেছি প্রেক্ষাগৃহের সামনে যেন মেলার ভিড়! আমরা নিয়মিত সদস্যরা লক্ষ করেছি অনেক অজানা মুখ—অনেক "অতিথি" বেতাবের তরুণ-তরুণী। সেই উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবিটি শিল্পগুণান্বিত এবং বিশ্ববন্দিত হলেও নীরব, নিষ্প্রাণ অভ্যর্থনা পেয়েছে, কারণ সে যে "ঠাণ্ডা"—"গরম" নয়!

মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে 'লাইট হাউস' প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত ফরাসী চলচ্চিত্রোৎসব। বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক ব্রেসোঁ-র (Bresson) "মুশেৎ" (Mouchette) শেষ হওয়ার পর প্রেক্ষাগৃহে তুলকালাম কাণ্ড—পুলিশের লাঠি-চার্জ ইত্যাদি। আশাহত, চলচ্চিত্র-শিল্পের বোদ্ধা অনেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলছিলেন: "চালাকী? পয়সা ফেরৎ চাই···দূর মশায়, কিসসু নেই···!" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অধ্যাপক চন্দন ভট্টাচার্য, কলকাতা-১৯

॥ ৩ ॥

ভাস্কর চৌধুরীর 'ফিলম সোসাইটিগুলি দর্শক রুচি কতটা পালটাতে পেরেছে?' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। একটা ভুল লক্ষ করলাম। লেখা হয়েছে যে সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা সিনে সেনট্রালের। কিন্তু সিনে সেনট্রালের সদস্য সংখ্যা ২৩০০ জন, দুর্গাপুর ফিলম সোসাইটির সদস্য সংখ্যা ৪৯০৮ জন। অতএব দুর্গাপুর ফিলম সোসাইটির সদস্য সংখ্যা সর্বাধিক লেখা উচিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ দাস, ঘনুয়াডী, ঝরিয়া

বিদেশী পুরস্কার

১৬ নভেম্বরের পরিবর্তনে নির্মল ধরের 'বিদেশী পুরস্কার : বাংলা ছবি' শিরোনামের তথ্যভিত্তিক ও চমৎকার বিশ্লেষণাত্মক রচনাটি পড়ে খুশী হলাম। এ প্রসঙ্গে আমি আর একটি তথ্য উল্লেখ করতে চাই। ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, মৃণাল সেনের মতো রাজনীতি এবং সমাজের অবক্ষয়, অপসংস্কৃতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তরুণ পরিচালক সৈকত ভট্টাচার্য বিদেশী পুরস্কার অর্জনের ক্ষেত্রে শিল্পসম্মত বাংলা ছবির গৌরবকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭৮ সালে ইতালির 'অ্যাভেলিনো ইনটার-ন্যাশনাল নিওরিয়ালিসট ফিলম ফেসটিভ্যাল' -এ সৈকতবাবু 'অবতার' ছবির জন্যে 'ডিপলোমা অব অনার' পেয়েছেন। এই ছবির কাহিনীকার ধনঞ্জয় বৈরাগী। মুখ্য চরিত্র দুটিতে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় ধ্যানেশ খাঁ এবং ক্যামেরায় তপন গুহঠাকুরতা প্রথম আবির্ভাবেই অসাধারণ কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। সার্থক স্যাটায়ার এবং রিয়ালিটিকে অবলম্বন করে সৈকত ভট্টাচার্য তার জীবনের প্রথম কাহিনী-চিত্র 'অবতার'-এর জন্য আত্মপ্রকাশের শুরুতেই যেভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অধিকারী হয়েছেন, তার থেকেই বোঝা যায়, চলচ্চিত্রের বিদেশী পুরস্কার এখন আর শুধুমাত্র সত্যজিৎ-তপন-মৃণালবাবুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখন দরকার সহযোগিতাসুলভ সুষ্ঠু সরকারী নীতির মাধ্যমে এইসব সৎ, সাহসী, সফল তরুণ চিত্র পরিচালকদের পাশে এগিয়ে এসে আরও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা। ফিলম ফিন্যানস করপোরেশনও এ ব্যাপারে উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা নিতে পারেন। আর্থিক সহায়তা, প্রচার এবং ডিসট্রিবিউশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে, ভবিষ্যতে আরও অনেক বাংলা ছবি বিদেশ থেকে সহজেই পুরস্কার কুড়িয়ে আনতে পারবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

কাজী মুরশিদুল আরেফিন,
খোলাপোতা

হতাশা কেন ?

১৬ নভেম্বরের পরিবর্তনে 'ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে এখন যাত্রা করতে হয় : উত্তম কুমার' নিবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পড়লাম। বাংলা চলচ্চিত্রের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে লেখাটি খুব সময়োপযোগী হয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধির মাধ্যমে জানতে পারলাম, উত্তমকুমার বিরক্ত এবং হতাশা বোধ করছেন, তার কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন। ১) ভালো স্ক্রিপট নেই। ২) যোগ্য পরিচালক নেই। ৩) ভালো চিত্রনাট্যকারের অভাব এবং ভালো দর্শকের অভাব। কারণ-গুলি সব না হলেও কিছুটা অন্তত সত্য।

ভালো। চিত্রনাট্যকার হবে কোথা থেকে? আজকাল একই ব্যক্তি চিত্রনাট্যকার, প্রযোজক, পরিচালক। বহুগুণে গুণী হতে পারেন আর কজন? ভালো। পরিচালকও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বাংলা ছবি দিনের পর দিন যেভাবে মার খাচ্ছে তা দেখেও লজ্জিত হতে হয়। সম্পূর্ণ দোষ দর্শকদের না দিয়ে আত্ম-সমালোচনা করে দেখুন তো, আপনাদের কাছ থেকে দর্শকই বা কি পাচ্ছে?

নেতারা প্রায়ই বলে থাকেন, 'চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে গিয়ে ওরা যেন শিক্ষাকে অসার না করে তোলেন। চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকারা যে ধরনের অভিনয় করেন তারই প্রতিচ্ছবি পাই পথে ঘাটে তরুণ-তরুণীদের আচরণে। নায়ক-নায়িকাদের দোষ দিচ্ছি না; কারণ, তারা তো পরিচালকের নিকট বন্ধকী হয়ে থাকেন। আসল কথা, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং প্রযোজকদের মানসিকতার পরিবর্তন চাই।

অর্পণ চৌধুরী
কাঁটাগঞ্জ, নদীয়া

নায়িকা

১৬ নভেম্বর সংখ্যায় 'বিশেষ প্রতিনিধি' লিখিত 'টালিগঞ্জে নায়িকা কই' প্রবন্ধে 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে সুমিত্রা দেবী অভিনয় করেছেন বলে উল্লেখ আছে। 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে সুমিত্রা দেবী কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জানালে বাধিত হব। যতদূর মনে পড়ে ভারতী দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী এবং সুপ্রভা সরকার অভিনয় করেছেন।

কৃষ্ণা বিশ্বাস,
কলকাতা—১৪

নেতাজী-কন্যা

১৬ নভেম্বর ১৯৭৯ সংখ্যার পরিবর্তনে তিমির মজুমদারের নেতাজী কন্যা প্রসঙ্গে লেখা চিঠি পড়লাম। নেতাজীর বিয়ে এবং কন্যার কাহিনী যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তা বুঝতে পেরে চিঠি লেখাতে পত্র লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নেতাজীর বিয়ে রটনার পর থেকেই বার-বার মনে হয়েছিল যে, নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যও জড়িয়ে আছে এই বিয়ে রটনার মধ্যে। কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই রটনা, তার কারণ জানবার জন্য, নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান চালিয়ে প্রায় বছর দেড়েক আগে উত্তর প্রদেশে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করি। সেখানে নেতাজীর বিয়ের ব্যাপারে যে একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছিল, তা আরো ঘনীভূত হয়। দ্বিতীয়বার কলকাতায় অনিতার আগমনে আরো সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তৃতীয়বার, উত্তর প্রদেশের ভদ্রলোক একটা চিঠি লিখে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অনিতার দিকে। ফলে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়।

আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলে আমার মনে হয়, তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে বলে জাপানীরা যা রটাচ্ছে ও নেতাজীর বিয়ে হয়েছে বলে যারা রটাচ্ছে তা তার ইচ্ছা অনুযায়ীই। তবে, প্রশ্ন ওঠে উনি বিয়ে না করে নিজের উপর এভাবে কাদা ছিটাচ্ছেন কেন! তার কারণও হয়তো আছে। উনি তাইহোকুতে যে নাটক শুরু করেছিলেন তা হয়তো শেষ করার সময় হয়নি। ততদিন পর্যন্ত নেতাজীর কন্যার ভূমিকায় অনিতা অভিনয় করে যাবে। এটাই আমার ধারণা ও বিশ্বাস।

আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফল আমি দেশবাসীর সম্মুখে রাখতে চেয়েছিলাম। এ বিষয়ে কয়েকটা প্রেসে লেখাও লিখেও-ছিলাম। কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে কোন কোন আগ্রহ দেখাননি।

আমি আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফল এবং সেই সঙ্গে দু-তিনখানা ফটো নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে রেখে দেব। তার অসম্পূর্ণ ইতিহাস যেদিন সম্পূর্ণ হবে, সেদিন আমার বক্তব্যও ইতিহাস মেনে নেবে।

মিত্রা এন্দ, দুলীয়াজান, আসাম

সাঁইবাবা

'সাঁইবাবা' অনেককেই দিয়েছেন দুর্লভ শান্তি—পড়লাম। সাঁইবাবা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাজ্যপালের বর্তমান সচিব শ্রীদীপক রুদ্র বলেছেন সাঁইবাবার অলৌকিক কাণ্ডকারখানা তাঁর ভেলকি মনে হয়নি। তার মতে যাদের অধ্যাত্মবোধ গভীর নয় তাদের মধ্যে ঐ ভাবে বিশ্বাস লালিত হয়। শ্রী রুদ্রের মতে যে অলৌকিক ক্ষমতা ছোটবেলা হতে সাঁইবাবা দেখিয়ে আসছেন তা এতদিনেও লয় হয়নি—সাঁইবাবার মহিমার এটা অঙ্গ। শ্রীরুদ্রের এটি ভুল ধারণা। এভাবে বিশ্বাস অর্জন হয় ক্ষণ-স্থায়ী। বিশেষ মুহূর্তের অঘটন ঘটনা পরবর্তী-কালে তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে সাধনা বা প্রযত্নের অভাবে। কাজেই আধ্যাত্মিক জগতের জন্য চেতনা আনতে বা জীবন ধারণের পরম সার্থকতার দিকে সাধারণ মানুষের চোখ ফেরাতে হলে বাইরের দৃষ্টিকে ভেলকি দেখিয়ে জয় করলে হয় না তাদের অন্তরকে জয় করতে হয়। তবে বলতে পারেন অলৌকিকত্ব কোন মহাপুরুষের জীবনীতে নেই? কিন্তু সেই অলৌকিকতা তারা তাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক নাগাড়ে দেখিয়ে যাননি। কাজেই সাঁইবাবার এই অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখে মনে হচ্ছে বর্তমানে আমাদের অধ্যাত্মবোধ একেবারেই গভীর নয় (অবশ্য শ্রীরুদ্রের মতে) নতুবা সাঁইবাবাকে ছোটবেলা থেকে এক নাগাড়ে অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে আসতে হচ্ছে কেন? কিন্তু এই অলৌকিক দর্শন দ্বারাই কি তিনি পারবেন জাতিকে ধর্মের পথে পরিচালিত করতে? জাতির নৈতিক চেতনাকে উন্মুক্ত করতে? শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই প্রশ্ন শ্রীরুদ্রের মনেও এসে দাঁড়িয়েছে—সবার মনেই আসবে। কারণ গৈরিকের সম্মান যেমন সবচেয়ে বেশি—তার দায়িত্বও তেমনি অসাধারণ।

এর পরের বক্তব্য ব্যবসাদার শ্রী দিলীপ চৌধুরীর। তার মতে বৈভব প্রাচুর্য ছেড়ে বিদেশীরা বাবার পায়ের কাছে মাথা রাখছেন কারণ এতে শান্তি পাওয়া যায়। মনের শান্তি নিজস্ব ব্যাপার। কেউ অল্পেই সন্তুষ্ট। কেউ প্রচুর পেয়েও অসন্তুষ্ট। কাজেই বিদেশীরা বাবার পায়ে শান্তি পান তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু দিলীপবাবুর শেষোক্ত মত যাতে তিনি বলেছেন অন্তরের ভক্তির দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অন্য প্রদেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে সেজন্য সাঁইবাবা কলকাতা আসেননি—এই কথাটা আমি মানতে রাজি নই। সাঁইবাবার কলকাতা আসার উপরই কি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ-বাসীর ভক্তি নির্ভর করছে? এই মুহূর্তে যদি সাঁইবাবা কলকাতা আসতে রাজি হন তবে কি দিলীপবাবু তার মত তৎক্ষণাৎ পালটিয়ে নেবেন? পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সঙ্গে নিশ্চয়ই দিলীপ-বাবু পরিচিত নন। কাজেই তার এই মত পরিষ্কার চিন্তাধারার নয়।

মহাসাধক রামকৃষ্ণ ও তাঁর উত্তর সাধক বিশ্বখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ কি অলৌকিকত্বের সাহায্যে ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর মন জয় করেছিলেন? সাধক স্বামী প্রণবানন্দজীই বা কি অলৌকিকতার সাহায্য নিয়েছিলেন? এদের মূলমন্ত্র কর্মযোগের ভিত্তিতে স্থাপিত এবং এই মহাসাধকেরা কি পশ্চিমবঙ্গ তথা অবিভক্ত বঙ্গের কোটি কোটি মানুষের ভক্তি পান নি না এখনও পাচ্ছেন না?

তাপসী নিয়োগী, গৌহাটি—১২

বেকার ডাক্তার

১৬ নভেম্বরের পরিবর্তনে স্বপনকুমার গোস্বামীর 'ডাক্তাররা কি সত্যি গ্রামে যেতে চান না?' লেখাটি পড়লাম।

ভারতবর্ষের হিমালয়প্রমাণ বেকারের মধ্যে ১০,২১২ জন এম বি বি এস এবং ৬১৯ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডাক্তার বেকার। চাকরির আশায় তারাও দিন গোনে। অথচ, তাদের চাকরির সুযোগ না দিয়ে উলটে তাদের ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে যে তারা নাকি গ্রামে যেতে চান না! এত বেকার ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও গ্রামের অসহায় মানুষের চিকিৎসার ভার দেওয়া হচ্ছে আড়াই বছরের বেয়ারফুট ডাক্তারদের উপর। ধনিকশ্রেণী মাত্রই তাবড়-তাবড় ডাক্তারদের চিকিৎসার অধীনে। গ্রামের মানুষদের উপর এই অবিচার করা ঠিক নয়। তাই, আজকে তদন্তের মাধ্যমে জনগণকে জানানো হোক ডাক্তারদের প্রকৃত দুর্দশার কথা। যত দ্রুত সম্ভব জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি তৈরি করে দেশের মানুষদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হোক।

কমল সেন, কলকাতা-২৭

লোধা

১ নভেম্বরের পরিবর্তনে সোমনাথ চক্রবর্তীর 'লোধা বলির জন্য দায়ী কি সাঁওতালরাই?' প্রতিবেদনটি পড়লাম। লেখক যে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে ঘটনা সম্পর্কে পরিবর্তনের পাঠক সমাজকে কিছু অবহিত করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। যে সব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি লোধাদের অর্থনৈতিক, মানসিক, সামাজিক পরিবর্তনের কাজে রত আছেন তাদের অসহায়তা বা ব্যর্থতা কিংবা সরকারের করে দেওয়া ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা ছেড়ে গতানুগতিক জীবনে লোধাদের ফিরে যাওয়া মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন জাগায়। তবে কি লোধাদের উন্নতির কোন পথ নেই? লোধারা চিরকাল চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি করবে আর মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ জনগণের বলির শিকার হবে?

লোধাদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সরকারকেই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। কিছু ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা, বিদ্যালয় কিংবা কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়ে দায় সারা গোছের দায়িত্ব পালন করলে কিছু হবে না। মানুষ জন্মসূত্রেই অপরাধী হয় না। অশিক্ষা, অসুস্থ সামাজিক পরিবেশ, অবহেলা, আর্থিক অনটন, শ্রমবিমুখতা মানুষকে অপরাধমুখী করে তোলে। তাদের বংশধরেরা যাতে কলুষিত হতে না পারে তার জন্য সরকারকে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হতে হবে। লোধাদের মধ্যে শিক্ষা, কুটিরশিল্প, কৃষিকার্য ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রসারের জন্য ধৈর্যশীল দায়িত্ববান কর্মী নিয়োগ করতে হবে। ঐ সব অঞ্চলে প্রশাসন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। নতুবা ঐসব অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি বজায় রাখা মুশকিল হয়ে পড়বে। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে হয়ত ঐসব অঞ্চলের লোধারা প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠবে। আরও বেপরোয়া হয়ে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। আর তখন হয়তো ২৬ সেপ্টেম্বরের ঘটনা থেকেও ভয়াবহ কোন ঘটনার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

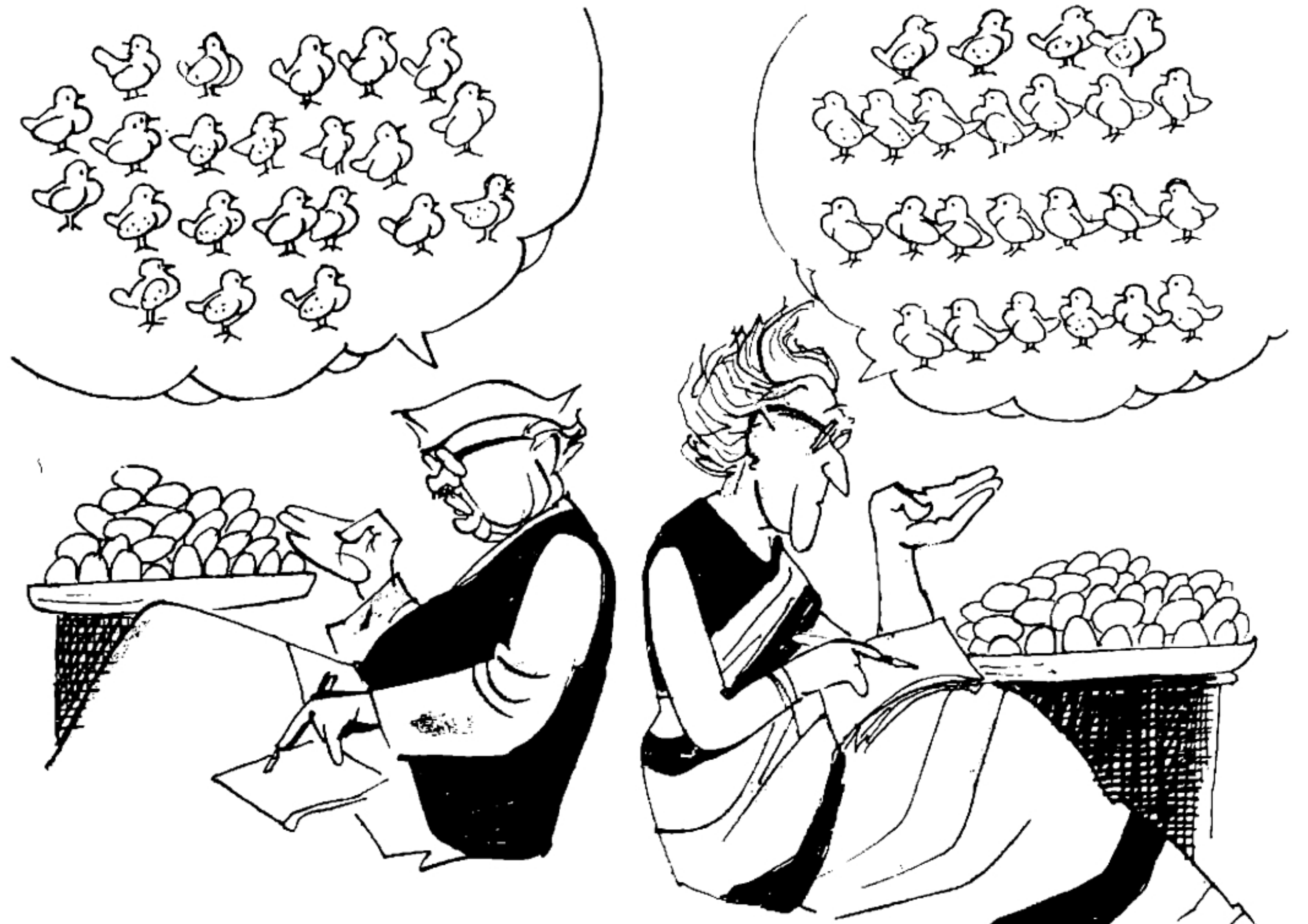
প্রতিবেদক লিখেছেন—'লোধারা যে ধরনের অপরাধ করে তাতে ধর্ষণের ভূমিকা নেই বললেই চলে, কেননা লোধাদের বিশ্বাস চুরির সময় মেয়েদের গায়ে পাপ মনে হাত লাগালে বামাল সমেত তারা ধরা পড়বেই। এ ভয়েই লোধারা মেয়েদের এড়িয়ে যায়।' লেখকের এই উক্তির সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। লোধারা যে ধরনের অপরাধ করে (চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি) তার সঙ্গে বরং ধর্ষণের যোগটাই বেশি করে থাকে। সংস্কারের বশবর্তী হয়ে লোধারা যদি মেয়েদের এড়িয়ে যেত তবে সাঁওতাল সমাজ এতটা খাপ্পা হতো না। ঐ নির্দিষ্ট বলাৎকারের ঘটনা পুলিশের খাতায় না থাকলেও লোধারা যে নারী ধর্ষণে লিপ্ত হয় তার কিছু আভাস মেলে প্রবোধকুমার ভৌমিক মহাশয়ের লেখায়। তিনি লিখেছেন (যুগান্তর ১১ অকটোবর ১৯৭৯, বিশেষ প্রবন্ধ)—'গোপীবল্লভপুর থানার ভীলা গ্রামের প্রায় পনের ঘর সাঁওতাল গাঁ ছেড়ে পালিয়ে আসে 'কেন্দুগাড়ী' সাঁওতাল গ্রামে। ঐ সময় 'ভালুকঘোরা' গ্রামে কোন এক সাঁওতাল বাড়ি ডাকাতি করার সময় লোধারা নারী ধর্ষণে লিপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, প্রায় পাঁচটি ডাকাতি ও রাহাজানিতে নারী ধর্ষণের প্রমাণ রয়েছে।" ১৯৬৮ সালে যে ঘটনা ঘটেছিল তার সঙ্গেও সাঁওতালী নারী ধর্ষণের ঘটনা জড়িত ছিল। সর্বস্ব খুইয়ে গেলেও সাঁওতালরা মুখ বুজে সহ্য করতে পারে কিন্তু অপর সম্প্রদায় কর্তৃক সাঁওতাল নারীর বলাৎকার অসহ্য। ঐ জায়গায় সাঁওতাল সমাজ খুবই স্পর্শকাতর। এক্ষেত্রেও নারী ধর্ষণের ঘটনা জড়িত ছিল বলে সাঁওতালরা এতটা উগ্র হয়ে উঠেছিল। আর অন্যান্য ভুক্তভোগী সম্প্রদায় হয়ত তলে তলে ইন্ধন যুগিয়েছে।

এই বছরের যে মাসে ঐ জেলারই গোয়ালতোড় থানার আমলাসুলী গ্রামে হাজার হাজার সাঁওতাল জনতা পুলিশের রাইফেলের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ছিল। ঘটনার সূত্রপাত—একজন সাঁওতাল রমণীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রশংসনীয় তৎপরতা ও বিচক্ষণতায় অঘটন এড়ান সম্ভব হয়েছিল। এক্ষেত্রেও হয়তো অঘটন এড়ান সম্ভব হতো যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আকারে-ইঙ্গিতে পাওয়া খবরের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

মদনমোহন মুর্মু
কালিঝরা, দার্জিলিং



এবার কুড়িটাকা সাম্মানিক পাবেন
দিলীপ রায়



অম্লমধুর

রচনা প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বিষয়—'মায়ের বুকের দুধ বাচ্চাদের জন্যে সবচেয়ে কেন ভালো?'

অনেকে অনেক কথা লিখেছে। একটি ছেলে অল্প কথায় লিখলো—

মায়ের বুকের দুধ সবচেয়ে ভালো। কারণ—

(১) এ-দুধকে গরম করতে হয় না,
(২) এ-দুধ কেটে যায় না বা নষ্ট হয় না,
(৩) বেড়ালে এ-দুধে মুখ দিতে পারে না,
(৪) এ-দুধের পাত্রটি খুব সুন্দর।

কিরণশঙ্কর মৈত্র

এক সাংবাদিককে প্রায়ই নাইট-ডিউটি করতে হয়। একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ লাগায় ভদ্রলোক ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে গিয়ে দেখলেন ঠাণ্ডায় গলা বসে গেছে। পাঁচিল টপকে স্ত্রীর শোবার ঘরের জানলায় টোকা দিতে দিতে ভদ্রলোক ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন—'দরজাটা খোল।' সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ফিসফিসে গলায় ভেতর থেকে বলল—'দরজা খোলা আছে। ঢুকে পড়ো।'



ভদ্রলোক আবার পাঁচিল টপকে সোজা অফিসের দিকে চললেন।

* * *

খবরের কাগজের অফিসে আসা একটি বিজ্ঞাপনের ম্যাটার: ওয়ানটেড এ স্টেনোগ্রাফার উইথ হানড্রেড টুয়েনটি স্পীড শর্ট-হ্যাণ্ডস।

*

এক ভদ্রমহিলা আরেক ভদ্রমহিলাকে ফোন করে বললেন—'যাই বলুন, গতকালের অনুষ্ঠানটা কিন্তু আপনার জন্যই সফল হয়েছে।'

অপর প্রান্ত থেকে বিস্মিত প্রশ্ন ভেসে এল—'তাই নাকি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি চলে যাওয়ার পরই অনুষ্ঠানটা জমে উঠেছিল।'

* * *

বাস স্টপে দাঁড়ানো এক মহিলা পাশের ধূমপানরত এক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বিরক্তভাবে বলল—'একটু দূরে সরে গিয়ে সিগারেট খান। নাকে মুখে ধোঁয়া আসছে।'

ভদ্রলোক বলল—'অসুবিধা হলে আপনি সরে দাঁড়ান।' শুনে ভদ্রমহিলা একেবারে খাপ্পা হয়ে বলল—'আপনি…আপনি… আমার স্বামী হলে আপনাকে আমি খুন করতাম।'

ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে বলল—'ঐ জন্যই তো তিন বছর ঘর করার পরই আপনাকে ডিভোর্স করেছিলাম।'

রত্না শূর



ব্যঙ্গচিত্র: লাহিড়ী

সিথোল থাকত মোজাম্বিক সীমান্তের কাছেই একটা গ্রামে। সুখী পরিবার ছিল তার। একদিন পড়ন্ত বিকেলে এক শ্বেতাঙ্গ গোয়েন্দা এসে খবর দিল, গেরিলারা আসছে। পুলিশ সে কথা শুনে সিথোলদের গ্রামে ঢুকে বেমক্কা গুলি চালাল। মারা গেল আঠারো জন। এরা কেউই গেরিলাদের কোন খবরই জানত না।

আরও অত্যাচারের ভয়ে সিথোল বউ ছেলেপুলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালাল। উদ্দেশ্য মায়াপুরী শহর সলসবেরীতে পৌঁছনো। এখন সে হারার স্টেশনের একজন কুলী। বউ ছেলেরা রাস্তায় রাস্তায় ফল বিক্রি করে।

এই রকম উদ্বাস্তু হয়েছে আরও অনেকেই। যেমন সলসবেরীর দোকান কর্মচারী সেই মেয়েটিও। থাকত মফস্বল শহরের একটি স্কুল হসটেলে। এক রাতে তারা শুতে যাবার আগে জামা-কাপড় পালটাচ্ছিল হঠাৎ পুলিশ এসে হসটেলে ঢোকে। যে যে এই অবস্থায় ছিল তাকে সেই অবস্থায় দুদিন ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কোনো খাবার তো নয়ই, জলও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি তাদের।

অন্য উদাহরণও আছে। গবিরা

দেশে দেশে

স্বাধীনতার জন্যে দেশপ্রেমিক কৃষ্ণাঙ্গদের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল অনেক আগে, সেই বৃটিশ শাসনের আমল থেকে। কিন্তু আয়ান স্মিথ দেশের 'স্বাধীন, সার্বভৌম' সরকার গঠন করার পর সংগ্রামের নল তার দিকেই ঘুরিয়ে দেওয়া হলো।

রোডেশিয়া বা জিমবাবোয়ের স্বাধীনতা সংগ্রাম দুটো ধারায় বয়ে চলেছে। একটি ছিল শান্তিপূর্ণ। তার নেতা রেভারেনড ন্দাভানিংগি সিথোলে এবং বিশপ আবেল মুজোরেওয়া। অন্যটি সশস্ত্র। তার নেতা রবার্ট মুগাবে এবং জোসুয়া নকোমো। শেষের ধারাটিই প্রবল ছিল।

জিমবাবোয়েকে স্বাধীনতা না দিয়ে বৃটেনের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামীদের হাতে সেই স্বাধীনতা দিয়ে সরে এলে সেখানকার শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থ এবং বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি হবে। দক্ষিণ- আফরিকার সোনার খনির মতো জিমবাবোয়েতেও রাণী এলিজাবেথের পারিবারিক সম্পত্তি আছে।

ফলে শান্তিপ্রিয় নেতাদের সঙ্গে আপস করেই এগোতে চাইল বৃটিশ সরকার এবং আয়ান স্মিথ।

কথা হলো, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অধিকাংশই হবেন কৃষ্ণাঙ্গ কিন্তু সংসদে মোট ১০০টি আসনের মধ্যে ৭২টি কৃষ্ণাঙ্গদের এবং ২৮টি নির্দিষ্ট থাকবে শ্বেতাঙ্গদের জন্য। মন্ত্রিসভায় অন্তত পাঁচজন শ্বেতাঙ্গকে নিতে হবে। তার মধ্যে আয়ান স্মিথও থাকবেন। এই শ্বেতাঙ্গদের ভোট ক্ষমতা থাকবে বিচার বিভাগ, বেসামরিক চাকরি ও নিরাপত্তা-বাহিনীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে। অর্থাৎ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সার্বভৌমত্ব পেলেন না—এটাই ধরে নিতে হয়।

এর জন্য নির্বাচনের ডাক দেওয়া হলো। সশস্ত্র—সংগ্রামী দল প্যাটরিআটিক ফ্রন্ট নির্বাচন বয়কটের ডাক দিল। কিন্তু ইউনাইটেড আফরিকান ন্যাশনাল কাউনসিল এই নির্বাচনে অংশ নিল। এর নেতা মেথডিসট পাদরি আবেল মুজোরেওয়া নির্বাচনে শ্লোগান দিলেন 'ইউ আর দ্য উইনারস।'

আবেল দেশের সবচেয়ে বড় উপজাতি 'সোনা' সম্প্রদায়ের লোক। বয়স ৫৪।

জিমবাবোয়েতে দরজা খুলেছে, আলো আসবে

সীমান্তের একটি স্কুলের এক হেডমাসটার মশাই বললেন: বেশ চালাচ্ছিলাম ছাত্রছাত্রী নিয়ে। এমন সময় গেরিলারা এল, আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করল। বাস, আর ছাত্রছাত্রী আসে না। সব চলে গেল গেরিলাদের সঙ্গে।

রোডেশিয়ার এই হচ্ছে এতদিনকার চেহারা। অবশ্য সে দেশের লোকেরা নিজের দেশকে ডাকে জিমবাবোয়ে বলে। আফরিকার অন্যান্য দেশের মতো এখানকার অধিবাসীরাও কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো। কিন্তু সেই গত শতাব্দী থেকেই শ্বেতাঙ্গরা এখানে শাসন করে আসছে। সেটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এখানকার শ্বেতাঙ্গ শাসক আয়ান স্মিথ ১৯৬৫-র মাঝামাঝি সময়ে এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তৎকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বাহ্যিক ভাবে এর বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়লেও স্মিথের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নিলেন না। হয়তো তাদের সায় নিয়েই স্মিথ অত সাহস দেখিয়েছিলেন।

বৃটেন ভেবেছিল দেশটা হাত ছাড়া হয় হোক, ওটা যেন কালোদের হাতে কোন ভাবেই না যায়। অথচ ও দেশে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা মাত্র ৪ শতাংশ মানে ২ লক্ষ ১২ হাজার। এই বৈষম্যই সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষিপ্ত করে তুলল।

বল্মীক

জিমবাবোয়ে: শব্দের লড়াই

রোডেশিয়া বা জিমবাবোয়েতে সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে শ্বেতাঙ্গরা যেটি বোঝায়, কৃষ্ণাঙ্গরা অন্যরকম সংকেতে তা বোঝায়। এই সংকেতের মধ্যে ঢুকে গেছে স্থানীয় উপজাতি শব্দ, রাগবি খেলার চলতি বুলি বা ভিয়েতনামী ভাষা। নিচে এরকম কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হলো:

অকসিলিয়ারি: যে মুক্তি যোদ্ধা সরকার পক্ষে যোগ দিয়েছে অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক। 'সোনা' উপজাতির ভাষায় এরা হলো পফুমো রে ভানহু। মানে জাতের বুকে শেল। **গ্যাট:** বন্দুক। **হারমোনি পিল:** বুলেট। ১৯৭৭ সালে শ্বেতাঙ্গরা বর্ণমৈত্রী বা রেসিয়াল হারমোনির কথা বলত। এটা তাকে ব্যঙ্গ করে। **হটি শ্লেয়ার:** রাইফেল। **স্লট:** শেষ করে দাও। **টেক দ গ্যাপ:** দেশ ছেড়ে পালাও। শ্বেতাঙ্গদের ভয়ার্ত বুলি। রাগবিতেও ব্যবহার হয়। **টের:** টেররিসট-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। **টাইনি-টের:** গেরিলাদের সাহায্য করে যে-সব শিশু।

অন্যতম সশস্ত্র নেতা রবার্ট মুগাবেও 'সোনা' উপজাতির লোক।

নির্বাচন কেন করা হলো এ-বিষয়ে স্মিথের মত: আমরা পছন্দ করি বা না করি, বাকি পৃথিবীর কাছে আমাদের সংখ্যালঘু সরকার গ্রহণযোগ্য নয়। আমি আগেও ভেবেছি, আমার জীবৎকালে কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন হতে দেব না। কিন্তু এ খেলায় কৌশল পালটানোর দরকার হয়ে পড়েছে। আমরা যদি পথ না বদলাই তবে টিঁকে থাকতে পারব না।

ভোটের জন্যে ৯০ হাজার সেনা সমাবেশ করতে হয়েছিল। দেশে ২০ হাজার বুথ খোলা হয়েছিল তার মধ্যে ১৫ হাজারের পাহারা দেবার দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনীর ওপর।

আবেল মুজোরেওয়া নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, (১) ভোটের পর যুদ্ধ শেষ করার ব্যবস্থা। (২) সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কায়েম। (৩) কৃষ্ণাঙ্গদের বেশি করে চাকরির ব্যবস্থা। (৪) সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা পয়সায় শিক্ষা। (৫) কৃষ্ণাঙ্গদের নিজস্ব খামার বাড়ি কেনার অধিকার।

শ্বেতাঙ্গরা ৭৫ একর পর্যন্ত জমি কিনতে পারে। অথচ কৃষ্ণাঙ্গরা কিনতে পারে মাত্র ৫ একর। রবার্ট মুগাবে বলেছেন: জমি

জমি জমি জমিই হচ্ছে দেশে বিতৃষ্ণার মূল কারণ। আমরা জমিকে জনগণের সম্পত্তি করে তুলব এবং তা বিলিয়ে দেব।

ভোট হলো এবং সবচেয়ে বেশি ভোট পেলেন ইউনাইটেড আফরিকান ন্যাশনাল কাউনসিলের নেতা আবেল মুজোরেওয়া। তিনিই নতুন মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হলেন।

কিন্তু প্যাটরিঅটিক ফ্রন্টেরনেতারা ঘোষণা করলেন ঃ এটি শত্রু-সরকার। আমরা একে উৎখাত করব।

প্যাটরিঅটিক ফ্রন্টের দুটি শাখা। একটি কাজ করে জামাবিয়া সীমান্তে। এর নেতা জোসুয়া ন্‌কোমো। এখানে ২৫ হাজার সশস্ত্র লোক আছেন। এদের অংশে ২ হাজার সশস্ত্র লোক রোডেশিয়ার বিভিন্ন শহর ও গ্রামে যোগাযোগের কাজ করেন।

অন্য শাখাটি রয়েছে মোজাম্বিক সীমান্তে। এর নেতা মুগাবে। ২৫ হাজার সশস্ত্র লোক এদিকেও রয়েছে। আর বাকি ৮৬০০ জন ছড়ানো রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে। এই রকম যোগাযোগরক্ষাকারী জনৈক ব্যক্তি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল পুলিশ তাকে যতই জিজ্ঞাসাবাদ করে তার একটাই উত্তর ঃ কেন এ-কাজ করছি জানি না। আমরা জানি আমরা জিতছি, জনগণ জানে আমরা জিতছি, সেনাবাহিনী জানে, আমরা জিতেছি।

ফলে বৃটিশ সরকার আলোচনা শুরু করলেন স্মিথ ও মুজোরেয়াকে নিয়ে। কিন্তু সে আলোচনায় কোন ফল হলো না। তখন শ্রীমতী থ্যাচার বাধ্য হলেন সশস্ত্র সংগ্রামের দুই নেতাকে ডেকে পাঠাতে। নানা সময়ে বহু আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আশার আলো পাওয়া গেছে। দক্ষিণ আফরিকার সেনারা আর জিমবাবোয়েতে থাকবেনা—এই প্রতিশ্রুতি বৃটিশ সরকার দিয়েছে। বৃটেনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী বলেছেন; ঐ দুই নেতা যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হয়েছেন। তবে কখন থেকে, কিভাবে যুদ্ধ বিরতি হবে এবং ঐ দুই নেতার স্থান কোথায় হবে তা অবশ্য কেউই পরিষ্কার করে বলেননি।

তবু আফরিকার মানুষ আশা করেন, দরজা যখন খুলছে, তখন আলো আসবেই।' ★

দিল্লিতে পরবর্তী সরকার বানানোর তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে

সুদীপ মজুমদার

দিল্লিতে গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান বলে একটা নামকরা বাড়ি আছে। তারই চত্বরে কয়েকদিন আগে এক অশান্ত ঘটনা ঘটে গেল, যা আজকের রাজনৈতিক সংকটের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। ভোটারস কাউনসিল (Voters' Council) সব রাজনৈতিক দল থেকে তাদের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। উদ্দেশ্য ভোটার ও নেতারা মুখোমুখি বসে চিন্তার আদান-প্রদান করা।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সভা শুরু হবার কথা ছিল। জনতা পার্টির রামকৃষ্ণ হেগড়ে আর কংগ্রেস-(আরস) এর তারকেশ্বরী সিনহা যথারীতি দেরি করে এলেন। হলঘর ঠাসা। বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী ছাড়া সাধারণ লোকজনও অনেক এসে ছিলেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন লোকদলের রাজনারায়ণ, সি পি এমের জয়পাল সিং। ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে এ আর আন্‌তুলের আসার কথা ছিল; কিন্তু তিনি আসেননি। প্রশ্ন করেছিলেন তিনজন। রাজকৃষ্ণ, যিনি এককালে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ছিলেন, সাংবাদিক শ্যামলাল ও প্রোফেসার রজনী কোঠারী।

সভা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই নেতাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। একমাত্র জয়পাল সিং ছাড়া বাকি সবাই একে অন্যের টুঁটি চেপে ধরেন। রাজনারায়ণ তো গলা ফাটিয়ে জনতার জাত-পাত উদ্ধার করতে শুরু করেন। মাঝখানে কেউ একজন কিছু বলে বসল। অমনি মুখ চোখ লাল করে তারকেশ্বরী সিনহা রেগে-মেগে একেবারে সভা ছেড়ে যেতে তৈরি অনেক অনুরোধ করে তাকে বসিয়ে রাখলেন কর্মকর্তারা।

হঠাৎ কোথা থেকে একদল চেলা-চামুণ্ডা-সহ বলরাজ মাধোক উপস্থিত। বললেন, জনসংঘ দলের প্রতিনিধি হিসাবে তাকেও বলতে দেওয়া হোক। বোঝান হল, আপনি তো আমন্ত্রিত নন। তাতে কি হয়েছে? মাধোক জোর করেই বক্তার জন্য নির্দিষ্ট একটা চেয়ার দখল করে বসে পড়লেন। চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, গণ্ডগোল। ভদ্রতার শেষ মুখোসটাও খসে পড়ল; তথাকথিত আলাপ আলোচনা খেউড়ে পরিণত হল। এসবের মাঝেই সভা চালান হল। প্রত্যেকেরই একই আবদার, আর একবার আমাদের সুযোগ দেওয়া হোক। আমরা দেখিয়ে দেব জনসাধারণের জন্য আমরা কী করতে পারি। জনতার হেগড়ে বললেন—আমরা স্বৈরতন্ত্রকে রুখব। রাজনারায়ণ চেঁচালেন—জনসংঘ ও আর এস এস এর সাম্প্রদায়িকতা নিপাত যাক।

সব নেতাই একের পর এক নানা আশ্বাস দিলেন। তারা নিজ নিজ দলের ইশতেহার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করলেন, কথা দিলেন। জিতে ফিরে এলে অমুক করে দেব তমুক করে দেব। মাঝে মাঝে হাসি শোনা গেল। প্রচণ্ড চাপা ক্রোধ লক্ষ করা গেল



নেতাদের কথাবার্তায়।

দিল্লিতে রাজনৈতিক বেচাকেনা কী ধরনের হবে তারই নমুনা পাওয়া যায় শান্তি প্রতিষ্ঠানের সভা থেকে। দল বদল, সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরতন্ত্রের বিপদ, কোয়ালিশন সরকার—সব কিছুর উপরই সে দিন আলোক-পাত করা হয়েছিল।

দল বদল প্রসঙ্গে সকলের নজর ছিল জগজীবন রামের প্রতি। জগজীবনের জনতা পারটি ত্যাগ আর ইন্দিরার সঙ্গে হাত মেলানোর সম্ভাবনা বড় জোরদার হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে।

রাম ভেবেছিলেন তিনি ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে সব কংগ্রেসীদের নেতা হবেন ও ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কিছু দর কষাকষি করতে পারবেন। কিন্তু গুজব শোনা গেল—যদি কংগ্রেস, চরণ সিংয়ের সরকার থেকে পদত্যাগ করে তবে রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডী সরকার ভেঙে দিয়ে উপরাষ্ট্রপতি হিদায়েতুল্লাকে সরকার চালাতে বলতে পারেন, তখন জগজীবন রাম হাত গুটিয়ে নেন ও কংগ্রেসীদের একজোট করার স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়ে কি করে ইন্দিরার কাছ থেকে বেশি সুবিধা আদায় করা যায় সে দিকে ঝোঁকেন।

জগজীবনের ছেলে সুরেশ, সঞ্জয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। দীনেশ সিং দু'পক্ষের মাঝে ঘটকের কাজ করলেন। ইন্দিরা গান্ধী জগজীবনকে পাবার আশায়, ইশতেহার প্রকাশ করার দিন পেছিয়ে দিলেন। ওদিকে জগজীবনও এক পাতার চিঠি তৈরি করে রেখেছিলেন। তিনি জনতা থেকে ছেড়ে চলে এলে, ওই চিঠি প্রকাশ করা হবে। তাতে বলা হবে—জনতা পার্টির ভেতরে কি করে জনসংঘ ও আর এস এস জগজীবনের জীবন

দুঃসহ করে ফেলেছিল। রাম চেয়েছিলেন কংগ্রেস (আই) এর সভাপতি হতে আর কমপক্ষে ওর নিজের ৪০ জন লোককে টিকিট দিতে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী দলের সভাপতিত্ব জগজীবনের মত অবিশ্বাসী লোকের হাতে দিতে নারাজ। কিন্তু অন্যদিকে হরিজন ভোটের প্রচণ্ড দরকার তার। শেষ পর্যন্ত রফা আর হলো না। তবে কথা পাকা হয়ে গেল রাম ও ইন্দিরার মধ্যে। নির্বাচনের পরে হাত মেলানোর ব্যাপারটা আবার একবার নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে দেখা যাবে। তাই নিরাশ হবার কিছুই নেই। দল বদলের পালা আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠানের ওই সভার ইশতেহারগুলিতে ভর করে নেতারা অনেক কিছুই বলেছিলেন। প্রশ্ন জাগতে পারেঃ এই সব নির্বাচনী ইশতেহারের মূল্য কতটুকু? সত্যিই কিছু না। অথচ এই ইশতেহারের বয়ানের প্রশ্নে কংগ্রেস ও লোক দলে ভাগাভাগি হয়ে গেল। জনতা পার্টি ইশতেহার প্রকাশ করতে দেরি করল। ইন্দিরা তো জগজীবনের আশায় দুবার ইশতেহার প্রকাশ বাতিলই করলেন।

গত ৩০ বছর ধরে কতবারই না ইশতেহার প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক দলের ইশতেহারই দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে দূর করার শপথ নিয়েছে। কিন্তু দুটোই বেড়ে চলেছে। এবারের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৩৬ কোটি। এর মধ্যে প্রায় ২৭ কোটি লোক নিরক্ষর। যারা সাক্ষর তারা সবাই যে খবরের কাগজ পড়েন তা নয়। আবার যারা খবরের পড়েন তারা যে রাজনৈতিক দলের ইশতেহার পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন তাও নয়।

একটু চাপ দেওয়াতে হেগড়ে ঐ সভায় স্বীকার করেন ইশতেহারের সবকটা প্রতিজ্ঞা যে রাখা যাবে না তা জনতা পারটির নেতারা বরাবরই জানতেন। যদি ইশতেহারের আশ্বাস সত্য হত তবে গত তিরিশ বছরে দরিদ্রের সংখ্যা ১৫ কোটি থেকে বেড়ে গিয়ে ২৬ কোটি হয়ে যেত না। তবুও কেন ইশতেহার প্রকাশ করার এত ধুম? এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে—পারটিগুলি ইশতেহারের মাধ্যমে নিজেদের কর্মীদের একই শ্লোগান আওড়ানার সুযোগ করে দেয়।

যেমন ধরা যাক ইন্দিরা দলের ইশতেহার। 'দেশে স্থিরতা চাই'—এই শ্লোগান ঐ দলের সমর্থকদের মুখে। তারা সবাই একজোট হয়ে ওই শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের তাতে কিছু এসে গেল কিনা সেটা বড় কথা নয়। তেমনি জনতা পারটির ইশতেহারে, 'স্বৈরতন্ত্র আর ইন্দিরার এমারজেন্সি' এ দুটো বিষয়ের ওপর সব চাইতে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যাতে দলের কর্মীরা নানান সভা সমাবেশে একই শ্লোগান দিতে পারে। একই কথা অন্যান্য পারটির বেলায়ও প্রযোজ্য।

একটু দেখা যাক. কোন সরকার কতটা কাজ করেছে? আর এইসব রাজনৈতিক বেশ্যাবৃত্তির মাঝে দেশের অর্থনীতির কী অবস্থা হয়েছে।

আজকে যা কংগ্রেস (আই) তার জন্ম হয় ১৯৬৬ সালে। আর তখন থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ১১ বছর বিনা বাধায় শাসন করেছেন ইন্দিরা গান্ধী। জনতা পারটির হাতে ক্ষমতা ছিল প্রায় আড়াই বছর। চরণ সিংয়ের লোকদলের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। কেননা ওরা তো শুধু তদারকী সরকারই চালিয়েছেন।

ইন্দিরা কংগ্রেস আর জনতা পারটি দুদলই বলেছে যে তারা যখন ক্ষমতায় ছিল বিস্ময়কর সব ব্যাপার ঘটেছে। শুধু আর একবার ক্ষমতায় আসতে পারলেই বাকি কাজগুলো করে ফেলা যাবে।

ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১১ বছরে জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছিল যথাক্রমে ৪ শতকরা ও ১৭ শতকরা হারে। জনতার আমলে জাতীয় আয় বাড়ে ৫.৮ শতকরা হারে আর মাথাপিছু আয় ৩.৪ শতকরা হারে। এতে জনতা পারটির কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নেই। কেননা ভাল বৃষ্টির জন্য প্রচুর উৎপাদন হয়। যার ফলে ওই হিসাব দেখানো সম্ভব হয়। যদি এই উদবৃত্ত কৃষি উৎপাদন বাদ দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে বাহবা কোনমতেই সরকারের প্রাপ্য নয়। কেননা যদি ১.৭ শতকরা প্রতিবছর মাথাপিছু আয় বাড়ে তবে আমেরিকার মতো জীবন যাপনের মানে পৌঁছতে গেলে ভারতবর্ষের আরও ২৩৬ বছর লাগবে। অথচ আমাদের জাতীয় সম্পদ, খনিজ সম্পদ, শ্রমশক্তি উদ্যোগ, এমন কি মূলধনও এত আছে যার দ্বারা গত ৩০ বছরে আরো অনেক বেশি উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। ভারত এখনও ১.৭ শতকরা মাথাপিছু আয়ে পড়ে আছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার মত দেশও ৩.৫ শতকরা হারে মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে চলেছে।

দুই দলেরই রাজত্বে মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। সরকার যত তথ্যই পরিবেশন করুন না কেন সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে না যে প্রতি মাসেই জিনিসপত্রের দাম কী হারে বেড়ে চলেছে। কখনও দাম বেড়েছে ধীরে ধীরে; কখনও সপ্তাহে সপ্তাহে। কংগ্রেস যদিও বা একটু কম ঘাটতি বাজেটের আশ্রয় নিয়েছে, জনতা তা একেবারে বদলে দিয়েছে।

১৯৬৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার শতকরা তিনভাগ। আজ শিল্পের এমন অবস্থা যে নতুন বছরে বিদ্যুৎ, কয়লা বা জ্বালানি আদৌ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সারা দেশ জুড়ে কয়লা, ইস্পাত ও বিদ্যুৎ সরবরাহে এক অভূতপূর্ব সংকট দেখা দিচ্ছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যও কমতে আরম্ভ করে দিয়েছে। গত দু'বছরে আমদানি, রফতানির তুলনায় প্রায় ১০০০ কোটি টাকা বেশি ছিল। রফতানি ১৮.২ শতকরা হারে বাড়ছিল কিন্তু জনতা রাজত্বে তা নেমে গিয়ে মাত্র ৫.২ শতকরা হারে দাঁড়িয়েছিল।

জনতার আড়াই বছর রাজত্বে সরকারী ব্যয় জাতীয় আয়ের ২৯.৭ থেকে ৩৩.৭ শতকরা হারে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিকে সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যার চাপে. আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। সরকারী আমলা আর নেতারা অবশ্য ফুলে ফেঁপে ওঠেন। এই সংকটময় পরিস্থিতির দিকে কোনও দলেরই ভ্রুক্ষেপ নেই। শুধু চাই ক্ষমতা, চাই গদি। পরবর্তী মন্ত্রিসভা গঠন করার উদ্যোগ পর্ব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বিদেশীরা বোধহয় এ ব্যাপারে একটু বেশি তৎপর। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

গত মাসের প্রথম সপ্তাহের কথা। নির্বাচনী ইশতেহার সব প্রকাশ হয়েছে, নির্বাচনী অভিযানও সবে শুরু হয়েছে। এমন সময় সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত শেখ আলি সুগাইর ইন্দিরা গান্ধীকে সম্বর্ধনা জানিয়ে এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। ইন্দিরা গান্ধীর এখন কোন সরকারী পদমর্যাদা নেই। তবুও একজন বিদেশী রাষ্ট্রদূত তাকেই সম্বর্ধনা জানালেন। রাজধানীর কূটনৈতিক নিয়মের ইতিহাসে এ এক অস্বাভাবিক ঘটনা।

ফাইভ-স্টার হোটেলের সেই ব্যাঙ্কোয়েট হলে ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া তার ছেলে সঞ্জয় গান্ধী হাজির ছিলেন। ইন্দিরা-সঞ্জয়ের খুব কাছাকাছি ঘোরাফেরা করেন এমন সব অনুচরেরা ছিলেন আমন্ত্রিতদের মধ্যে। যেমন মহম্মদ ইউনুস মোহসিনা কিদয়াই, নুরুল হাসান, নারায়ণ দত্ত তিওয়ারী, শাহনওয়াজ খান প্রমুখ। ভোজের পরে ইন্দিরা গান্ধী একটা ছোট ভাষণ দেন। সম্মিলিত অতিথিরা আর অন্যান্য বিদেশী প্রতিনিধিরা যেভাবে ইন্দিরার আপ্যায়ন করলেন মনে হল যেন তিনিই ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বাইরের লোকের কাছে এই নৈশভোজের কথা তেমন পৌঁছায়নি। কিন্তু কূটনৈতিক মহলে এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে বেশ কয়েকদিন।

রাজধানী দিল্লির আগামী দিনগুলো হবে গুপ্ত মিটিং, বেচা কেনা আর ষড়যন্ত্রের। পাশাপাশি গভীর সমস্যাগুলো আরও প্রকট হয়ে দেখা দেবে। ইশতেহারের সব বুলি হবে বিস্মৃত। সংসদীয় গণতন্ত্র গভীর সংকটের দিকে আরো এক পা এগিয়ে যাবে। ★

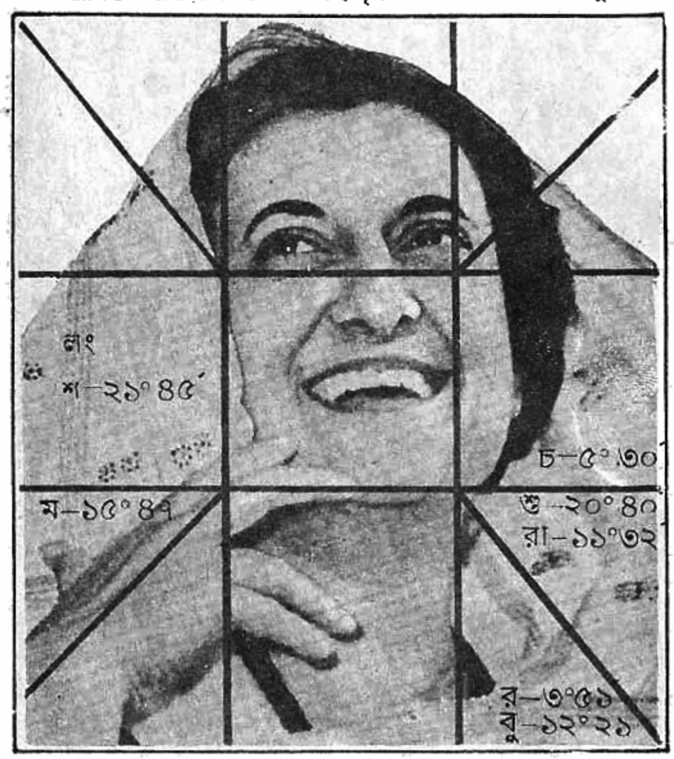
জ্যোতিষের আলোকে তিন প্রধান

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৮০-র জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে যদি লোকসভার নির্বাচন হয় এবং ইন্দিরা গান্ধী, জগজীবন রাম এবং চরণ সিং যদি ঠিকমত নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারেন তাহলে এদের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর আধিপত্যই বেশি বিস্তারিত।

নানাদিক থেকে এদের রাশিচক্র বিচার করলে দেখা যায় শ্রীমতী গান্ধীর গ্রহবল এখন থেকে কয়েক বছর অনুকূল। শ্রীমতী গান্ধীর এখন শনির দশায় শুক্রের অন্তর্দশা চলছে। দশাপতি শনির মিত্র শুক্র জন্মকালীন বৃহস্পতির সঙ্গে বিনিময় যোগ করেছেন। ('দ্বিজের ঘরে দ্বিজের থানা/হেলায় পোষে শতেক জনা'—খনার এই বচনটি শ্রীমতী গান্ধীর জীবনে বাস্তবে পরিণত হবে।)

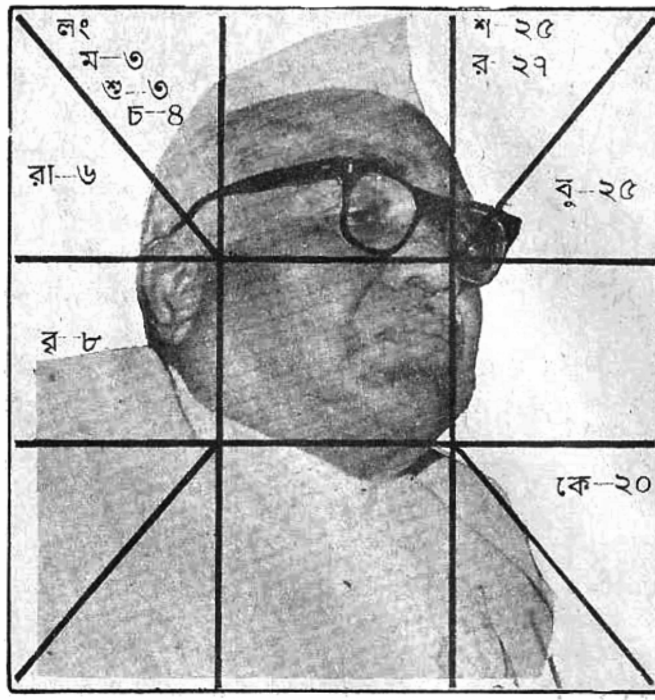
শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষেত্রে সিংহস্থ বৃহস্পতি জন্মকালীন শুক্রকে



এবং দশমস্থানকে পূর্ণভাবে দৃষ্টিদান করায় শ্রীরামের চাইতেও অনেক বেশি শুভযোগের কারক হয়েছে।

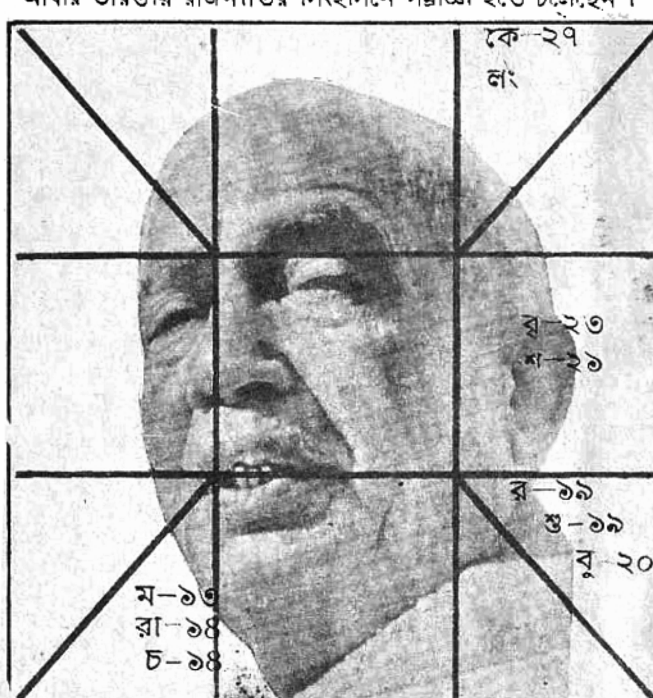
জগজীবন রামের গ্রহযোগও যথেষ্ট ভালো। পঞ্চমপতি বুধ শ্রীরামের রাশিচক্রে দশমে অবস্থান করছে। এই বুধের দশা সম্ভ্রম, মর্যাদা এবং পদবৃদ্ধির সহায়ক; যা শ্রীরাম লাভ করেছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়ে। কিন্তু বুধ বালক গ্রহ, স্বভাবে চঞ্চল। তাই বেশিদিন শুভ ফলটি ধরে রাখতে পারল না। জন্মকালীন বৃহস্পতি বুধকে রাশিদৃষ্টিতে দেখছে বটে কিন্তু দশা ক্রমানুযায়ী ষষ্ঠদশা হলে বুধের দশা অনেকক্ষেত্রেই শুভ বুধের সম্পূর্ণ সুফল দিতে পারে না। গোচরেও বৃহস্পতি দশাপতি বুধকে দৃষ্টি দিচ্ছে এবং শুভফলের আধিক্য বাড়াবার চেষ্টা করছে।

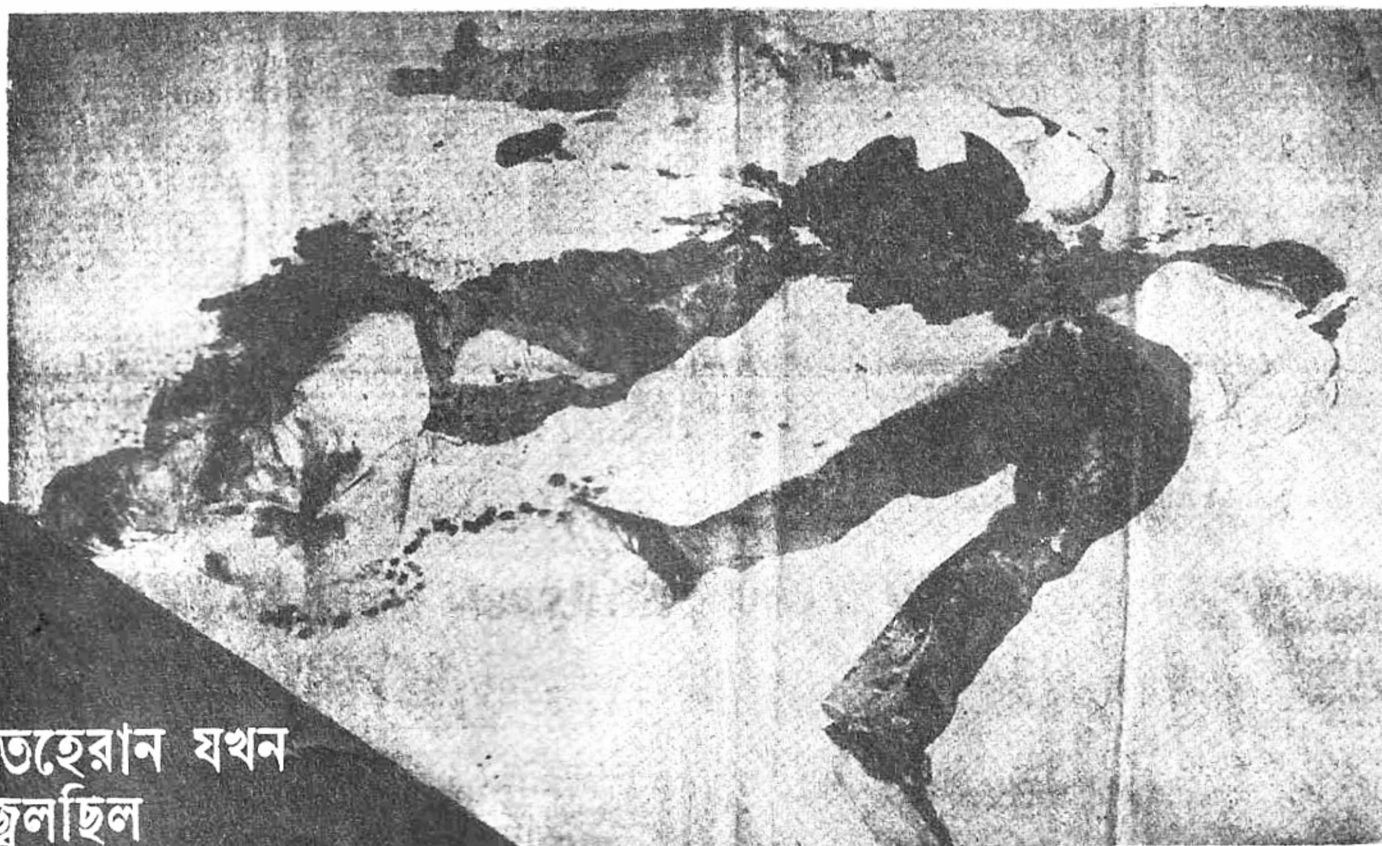
শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীরামের গ্রহবলের তফাৎ ১৯৮০ সালে



খুবই সামান্য। তবুও কূটকৌশলী শুক্র অদম্য আকাঙ্ক্ষা যুক্ত [illegible] সঙ্গে জন্মকালে যুক্ত থাকায় এবং গোচরে বৃহস্পতির শুভ-দৃষ্টির সহায়তা পাওয়ায় যেনতেন প্রকারেণ শ্রীমতী গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। তবে বৃহস্পতির ঘরে শুক্র গোচর বৃহস্পতি দৃষ্ট হওয়ায় হঠাৎ ক্ষণিক বৈরাগ্য আসাটাও বিচিত্র নয়। আর যদি তা আসে তাহলে হয়ত শ্রীমতী গান্ধী অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী করে রাজনীতির চাবিকাঠিটি নিজের হাতে রেখে এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি করতেও পারেন।

শ্রী চরণ সিংয়ের রাশিচক্র ১৯৮০-তে শ্রীমতী গান্ধীর তুলনায় অনেক দুর্বল। এদের তিনজনের যে কোষ্ঠী আমার হাতে এসে পৌঁছেছে তা থেকে মোটামুটিভাবে বলা যায় ইন্দিরা গান্ধীই আবার ভারতীয় রাজনীতির সিংহাসনে সম্রাজ্ঞী হতে চলেছেন।





তেহেরান যখন জ্বলছিল

ডাঃ কালীকৃষ্ণ চ্যাটারজি

৩১ অক্টোবর, ১৯৭৮। দীপাবলীর রাত্রি। পালাম বিমানবন্দর থেকে আমাদের প্লেন ছাড়লো রাত একটায়। গন্তব্য : তেহেরান। দিললি থেকে কতোটুকুই বা পথ। ল্যানডিং গিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে ইনটারকম জানিয়ে দিলো : মেরাবাদ বিমান বন্দরে কর্মী ধর্মঘট।

পেশায় ডাকতার। ইরানে চাকরির সুবাদে বছরখানেক আছি, কয়েক বছর থাকবো। দেশে গিয়েছিলাম এক মাসের ছুটি কাটাতে। 'ধর্মঘট' শব্দটা শুনে চমকাইনি। কলকাতার লোককে ধর্মঘট দেখানো আর নিউক্যাসেলের লোককে কয়লা চেনানো তো একই ব্যাপার।

কিন্তু এ 'ইত্তেসাফ' যেন অন্য কিছু। বিয়ার, কোকাকোলা তো দূরের কথা এয়ার পোরটের সিগারেটের স্টলটাও বন্ধ। স্বাস্থ্য-বিভাগ, কাসটমসের লোকেরা পর্যন্ত নেই। থুতনি ঝুলে পড়া এক বিষণ্ণ পুলিশ কর্মচারী গম্ভীর মেজাজে পাস-পোরট পরীক্ষা করে প্রবেশাধিকারের ছাপ দিয়ে দিলেন। একেবারেই ভিড় নেই এয়ার পোরটে। চারদিক ভুতুড়ে খাঁ খাঁ।

এয়ার পোরট থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাকসিরও টিকি দেখতে পেলাম না। অনেক কষ্টে একটা গাড়ি পেলাম। ভাড়া দিতে হলো নির্দিষ্ট ভাড়ার দশগুন। যাই হোক, বন্ধুর ডেরায় উড়নচণ্ডীর মতো হাজির হলাম যখন, তখন ঘড়িতে ভোর চারটে।

১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি যখন প্রথম এদেশে এসেছিলাম তেহেরান শহরটি দেখে মনে হয়েছিল, এ শহর যেন লটারির প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। আলোকসজ্জিত প্রশস্ত রাস্তাঘাট। নানান পণ্য সাজানো দোকান। রাস্তায় বিদেশি গাড়ির স্রোত। ফিটফাট নওজোয়ান আর সুবেশা তরুণীর ভিড়। ভিড় উপচোনো বার আর ক্যাসিনো। গোটা শহরটা যেন গা ভাসিয়ে দিয়েছে আমোদের জোয়ারে। আর সেই শহরের সর্বত্রই দামী কাঠের কিংবা রুপোর ফ্রেমে শাহনশা তাকিয়ে আছেন আন্দোচ্ছল মানুষজনের দিকে। মহম্মদ রেজা পহল্লভি শাহনশা আরিয়ামেহর। প্রশস্ত কপাল, আয়ত চক্ষু, তীক্ষ্ন নাক, ঠোঁটের কোণে কিছুটা বা নিষ্ঠুরতার ঝিলিক।

বন্ধুর বাড়িতে গল্পগুজব করার ফাঁকে ফাঁকে আমার চোখে বারবার ভেসে উঠছিল গত ৮ সেপটেমবরের (৭৮) তেহেরানের ছবি। সে দিনটিতেই ইরানের ইতিহাস মোড় নিয়েছিল অজানা ভবিষ্যতে। আরো অনেক বিদেশির সঙ্গে আমিও ছিলাম একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ইরানে আমার কর্মস্থল ছিল সারি শহরে। সেখানে শুনতাম, রাজধানী তেহেরানে রাজনৈতিক গণ্ডগোল। আমি রাজনীতি সচেতন পশ্চিমবাংলার মাছভাত খাওয়া বাঙালী। কমিউনিসট পারটি নিষিদ্ধ, খাদ্য আন্দোলন, যুক্তফ্রনট, নকশাল বিস্ফোরণ, বাংলা বনধ—এসব চোখে দেখা মানুষ আমি। তেহেরানে রাজনৈতিক গণ্ডগোল—শুনে সারি শহরে বসে ভাবতাম, যে দেশে সুগঠিত রাজনৈতিক দলই নেই সেদেশে আবার রাজনৈতিক আন্দোলন! ভুল ভাঙলো ৮ সেপটেমবর ৭৮ তেহেরানের রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ১৯৭৮ এর আগসট মাসের শেষ কটা দিন আর সেপটেমবরের প্রথমার্ধ আমার কেটেছিল খোদ রাজধানী তেহেরানে।

৮ সেপটেমবর ছুটির দিন। শুক্রবার। বড়ো শীত। ভেবেছিলাম কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেব দিনটা। অশোক এসে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল। অশোক দিললির ছেলে, এনজিনিয়ার। এক সময়ের নকশাল-পন্থী অশোক যেন টগবগে ঘোড়া। বললো : দাদা, জোর গুজব আজ ঘটবে বিরাট কিছু, চলুন গা গরম করি রাস্তায় গিয়ে। ইচ্ছে ছিল না বিছানা ছাড়ার, কিন্তু অশোক এমনই একটি চরিত্র যার দরাজ হাসি যখন তখন 'না' কে 'হ্যাঁ' করতে পারে।

পায়ে পায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাব—এই ছিল দুজনের প্ল্যান। নুরে হাওয়াই থেকে বেরিয়ে কিছু দূর গিয়ে দেখি বিশাল খুরুশ ডিপারটমেনটাল স্টোরস পুড়ে ছাই, রাস্তার ওপর ছড়ানো কারপেট জ্বলছে তখনও।

আশেপাশে ব্যাংক আর পানশালাগুলি তছনছ, ভাঙা কাচের টুকরো ছড়ানো চারদিকে। গাছের গুঁড়ি দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। ট্রাকে ট্রাকে স্টেনগান উঁচিয়ে টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী।

কুড়ি-বাইশের ছেলের দল সরু সরু গলির মুখ থেকে ছুঁড়ছে ইঁট পাথর। লক্ষ্য : সামরিক বাহিনীর গাড়ি। মাঝে মাঝে কাছে দূরে বোমার শব্দ আর আগ্নেয়াস্ত্রের তীক্ষ্ণ শিস। কোনদিকে যাবো—আমি চিন্তিত। অশোক বললো, ঘাবড়াও মাৎ। আমরা বিদেশি—জনসাধারণ কিন্তু আমাদের প্রতি চমৎকার ব্যবহার করছিল।

তেহেরানের সব গলিপথ অশোকের চেনা। টিয়ার পোড়া ধোঁয়া আর টিয়ার গ্যাসের গন্ধ যতোটা পারা যায় ততোটা এড়িয়ে দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে লাগিয়ে এলাম তেহেরানের বাজার এলাকায়। ঠিক যেন কলকাতার বড়বাজার। মধ্যিখানে মসজিদ। লোকে লোকারণ্য মসজিদ এলাকা। তার ঠিক উলটো দিকে চৌরাস্তার ওপারে ট্যাংক আর জঙ্গী গাড়িতে শাহর সেনাবাহিনী। শুনলাম দুপুরের নামাজের পর সেনাবাহিনীকে অগ্রাহ্য করে বেরোবে মিছিল। কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি। অশোক বললো—চলুন দুপুরটা ওখানেই কাটাবো।

দুপুরের নামাজে যেন সারা তেহেরান গম গম করছিল। তারপর শুরু হলো মিছিল। বন্ধুর বাড়ির তিনতলার জানালা দিয়ে দেখছি ; ততক্ষণ রাস্তায় শুরু হয়ে গেছে খণ্ডযুদ্ধ। এক দিকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল অন্যদিকে মলোটভ ককটেল। জানালা বন্ধ করে দিলেন বন্ধুর স্ত্রী—কিছুতেই সামান্য ফাঁক করেও দেখতে দেবেন না। গুলি গোলার শব্দ ছাপিয়ে কানে আসছিল আর্তনাদ আর এ্যামবুলেনসের সাইরেন।

ঘণ্টাখানেক -হঠাৎ সব শান্ত। বাইরে বেরিয়ে দেখি রাস্তায় চাপ চাপ রক্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে ওভারকোট টুপি ; মৃতদেহ দেখলাম না একটাও। ব্যাংক সিলি, সাদারাত, মেপা প্রত্যেক ব্রানচ পুড়ে ছাই—দাঁড়িয়ে আছে শুধু লোহার খাঁচা। আমির কবির এ্যাভিনিউয়ে তখনো দাউদাউ পুড়ছে আর্মস্ট্রং হোটেল। ক্যাভারণ স্ট্রিট আর সোলাভি চৌরাস্তার বিরাট সুপার মারকেটের ওপরের চারতলা পুড়ে দলা পাকিয়ে আছে।

বাড়ি ফেরার পথে পহল্লভী স্ট্রিটে এসে পৌঁছেছি—হঠাৎ হইচই। পাগলের মতো যে যেদিকে পারছে ছুটছে। কি ব্যাপার? কাউকে প্রশ্ন করার আগেই মাথার ওপর হেলিকাপটারের ঘট ঘট। 'পালাও পালাও, গুলি ছুঁড়বে'—দিকভ্রান্ত ছুটলাম। কখন জানিনা, দেখলাম আমি ও অশোক এসে হাজির হয়েছি বাসস্ট্যানডের নিরাপদ আশ্রয়ে।

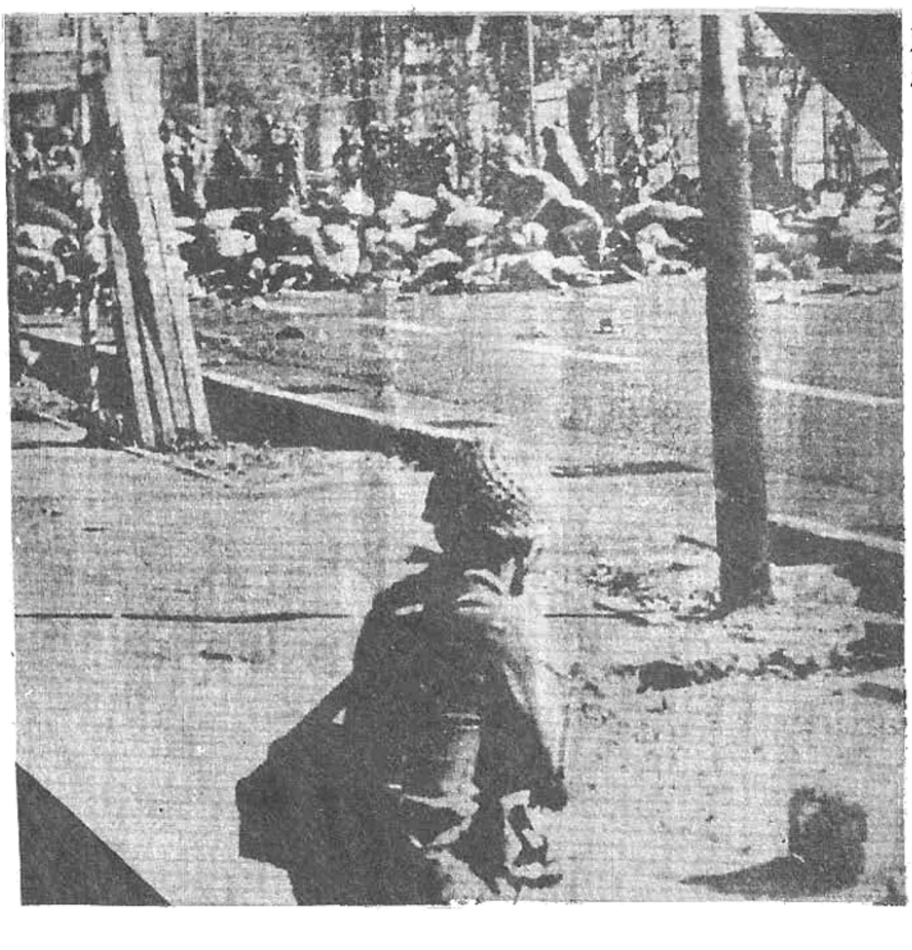
কি করে ডেরায় ফিরেছিলাম তা আজ ভাবলে গা শিউরে ওঠে। বিছানায় শ্রান্ত ক্লান্ত লেপ মুড়ি দিয়ে খবর শুনলাম রেডিওতে : শুধু তেহেরানে ঘটেছে একশোটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। তাব্রিজ, কাজেরুন, সিরাজ, মাসাদ, জোহরম, আহবাজ—সর্বত্র প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আগুন আর গুলি। তেহেরান সহ সব কটি শহরেই ঘোষিত হয়েছে কারফিউ।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙলো কলিং বেলের আওয়াজে। ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা। দরজার দিকে এগোতে খুব ভয় করছিলো। 'ডাঃ চ্যাটারজি, দরজা খুলুন, জলদি'—পরিচিত গলা শুনে সে ভয় কাটল। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে আশ্রয় চাইলো আমাদের পরিচিত ইরানী ছাত্র সোমালি। সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি, আমিও না। তার মুখে শুনলাম তেহেরানের পূর্বপ্রান্তে জালে স্কোয়ারের ঘটনা। শিশু নারী সমেত হাজার হাজার মানুষ জমা হয়েছিল মিছিলে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিতে কতোজন প্রাণ দিয়েছে তার হিসেব নেই। ফায়ার ব্রিগেডের হোসপাইপ ধুয়েছে মানুষের রক্ত, বুলডোজারে তুলতে হয়েছে মানুষের লাশ।

১৯৭৮ সালের ৮ সেপটেম্বর কালো শুক্রবারে শুরু হলো ইরান-ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। ১১ সেপটেম্বর শাহানশা মনোনীত প্রধানমন্ত্রী জাফর সরিফ ইমামি মজলিশে পাশ করালেন সামরিক আইন।

৮ সেপটেম্বর ১৯৭৮—দিনটি ইরানে হঠাৎ কোন বিস্ফোরনের দিন নয়। যুগ যুগ ধরে চলে আসা অত্যাচারের পরিণাম ঐ দিনটি। বলতে গেলে আধুনিকতার খোলশে ঢাকা এক বর্বর মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র চালু ছিল ওই দেশে। চারটি ছাত্রকে এক সঙ্গে রাস্তার ওপর গল্প করতে দেখলেই প্রশাসন ভাবতো শাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার কিংবা ঝামেলাহীন গুলিবর্ষণ··· 'ষড়যন্ত্রকারীরা' খতম।

জানতাম কোন দেশেই অন্তত তিনটি জায়গায় ঢুকতে অনুমতির দরকার হয়না—রেল স্টেশন, বিশ্ববিদ্যালয় আর পোসট অফিস। কিন্তু ৭৭ এ প্রথম ইরানে এসে অন্য রকম অভিজ্ঞতা হলো। তেহেরাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ডঃ নাদিম নেমন্তন্ন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ভিড়, যারা ঢুকছেন, তারা ছাত্র বা শিক্ষক যেই হোন না কেন, গেটের সশস্ত্র প্রহরীকে দেখাচ্ছেন পরিচয়পত্র। মনে হলো ফোরট উইলিয়মের গেটে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পরিচয় পত্র নেই, তাছাড়া ভালো ফারসী বলতে পারিনা; দু ঘণ্টা ধরে কসরৎ করেও ঢুকতে পারলাম না। ইংরেজি জানা



শাহবিরোধী মিছিলের ওপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ : রাজপথে মৃত-আহতের স্তূপ

একটি ছাত্রী উদ্ধার করলো আমাকে। তার কথামতো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই পাবলিক হাইজিন ইনসটিটিউট থেকে ফোন করলাম ডঃ নাদিমকে। ছুটে এলেন স্বয়ং ডঃ নাদিম। লজ্জিত, অধোবদন। লৌহ কপাটের মাঝখানের সামান্য ফোকর দিয়ে ডঃ নাদিমের পিছু পিছু প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

সেদিন সারাদিন কাটিয়ে ছিলাম তেহেরান বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেখেছিলাম : ক্লাস চলছে, বাইরের করিডরে কোমরে বন্দুক,হাতে ব্যাটন পায়চারি করছে পুলিশ ; লাইব্রেরিতে কে কি বই নিচ্ছে তাও নজর রাখছে পুলিশ। আলাপ হয়েছিল বহু অধ্যাপক, ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে। প্রাণ খুলে কথা বলেননি কেউই। শুধু একজন ছাড়া। উড়োচুল, চেক শার্ট গম্ভীর চোখের সেই পোসট গ্রাজুয়েট ছাত্রটিকে আজও মনে পড়ে। নানান উলটো পালটা আলাপের ফাঁক ফোঁকরে সে টুকরো টুকরো করে গুঁজে দিয়েছিল সেই সব কথাগুলি, যা শোষিত বঞ্চিত ইরানবাসীরা বিশ্বকে জানাতে চায় : 'আমাদের দেশে আধুনিক সুযোগ সুবিধা আছে নেই অক্সিজেন ...তরুণ ছেলেরা এ দেশে হারিয়ে গেলে, তাদের মৃতদেহও কখনো খুঁজে পাওয়া যায়না ...শাহনশার রয়েছে নিজস্ব গুপ্তচর বাহিনী-সাভক...শুধু ইরানেই নয়, সাভকের লোকেরা বিদেশে প্রবাসী ইরানীদের, বিশেষ করে ছাত্রদের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে...এই রীতি চলে আসছে শাহনশার বাবা রেজা খাঁর আমল থেকে।'

শুধু কি সাভক গুপ্তচর বাহিনী? না, ইরানে ছিল আরো এক গুপ্ত বাহিনী—Free Masous—গুপ্ত ভ্রাতৃ সংঘ। ইরানের মাটিতে পা দেবার পর থেকেই কানাঘুষা শুনেছি, এই দল সম্পর্কে। ইরানের রাজনীতি, সরকারি কাজকর্ম, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ—সব কিছুরই চাবিকাঠি ছিল এই গুপ্তবাহিনীর হাতে। রাজকীয় সিয়া মুসলমান ধর্মের প্রতি কিন্তু এদের বিন্দুমাত্র আনুগত্য ছিল না। এই সংঘের সদস্যরা বিশ্বাস করতো—হাজার হাজার বছর আগেকার জেরুসালেমের সুলেমানের সঙ্গে এদের জন্মসূত্রের যোগ রয়েছে।

Free Masous সংঘের সাহায্য বা সমর্থন ছাড়া কেউ কখনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের উঁচু পদে উঠতে পারতো না। ইরানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন আলি থেকে শুরু করে জাফর সরিফ ইমামি, মেহেসেন ফারহাঙ্গী, আমির আব্বাস কয়েক শো উঁচু রাজকর্মচারী ছিলেন গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘের সদস্য।

সংঘ পরিচালনার পদ্ধতিও ছিল সৃষ্টি-



ব্যারিকেড! ব্যারিকেড!

ছাড়া। যে কেউ ইচ্ছে করলেই এর সদস্য হতে পারতো না। প্রস্তাবক হিসাবে সংঘের প্রধান কোন সদস্যের সমর্থন ছাড়া সদস্য হওয়া যেতোনা। যেকোন ছ জন সংঘ সদস্য যদি কাউকে সংঘে নিতে সম্মত না হতেন তাহলেও সদস্য হওয়া যেত না। নতুন সদস্যকে মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করতে হতো ; সামান্য কোন চ্যুতি বা বিশ্বাস ভঙ্গের শাস্তি ছিল 'মৃত্যু'। আর সে মৃত্যুদণ্ডদানের পদ্ধতি বড়ো ভয়ানক —বিশ্বাসভঙ্গকারীকে আতঙ্কের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে গোপনে হত্যা।

শাহ বিরোধী ইরানীদের গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রথম আহ্বান জানান ডঃ মহম্মদ মোসাদেক। আজ থেকে আঠাশ বছর আগে। ডঃ মোসাদেক ছিলেন ইরানের প্রধানমন্ত্রী ; কিন্তু তার জনপ্রিয়তায় বিচলিত হয়ে শাহ ১৯৫২ সালে ডঃ মোসাদেকের পরিবর্তে আহাম্মদ কোয়ামভকে প্রধানমন্ত্রী করেন। কেঁপে উঠলো ইরানের আকাশ বাতাস। জনসাধারণের রোষে বাধ্য হয়ে মত পালটান শাহানশা রেজা পহলভী। আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন ডঃ মোসাদেক।

আমি যে ইরানকে দেখেছি, সেই ৭৭-৭৮-এর ইরানের দেওয়ালে দেওয়ালে আয়াতুল্লা খোমাইনির বাণীর পাশে দেখেছি ডঃ মোসাদেকের বিখ্যাত উক্তি : মজলিস (পারলামেনট) হলো জোচ্চর জমিদার আর শয়তান তেল কারবারীদের আড্ডা।

ডঃ মোসাদেকই প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন তেলের সমস্ত কারবার।

ডঃ মোসাদেক নিহত হন গুপ্ত আততায়ীদের হাতে।

তারও এক দশক পরে ইরানের গণ আন্দোলন পা বাড়ায় রক্তাক্ত পথে। ১৯৬৩ সালে বিজনজাহানি, হাসান জিয়া, আব্বাস সুরাকি, ফারাহানি, আজিজ সারমাস্তি গড়ে তোলেন গোপন গেরিলা বাহিনী। তারা ঘোষণা করেন নিয়মতান্ত্রিক গণআন্দোলন নয়, একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লব। ১৯৬৩ থেকে ৬৬ সাল পর্যন্ত এরা গোপনে সংগঠন বাড়িয়ে তোলেন, কয়েকটি শহরে এদের হাতে নিহত হয় বেশ কয়েকজন রাজকর্মচারী। কিন্তু ৬৬ সালেই হঠাৎ দলীয় এক কর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় এ দলের নেতৃস্থানীয় অনেকেই ধরা পড়েন। অনেকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যোগ দেন প্যালেসটাইন লিবারেশন আর্মিতে। ফারাহানি প্যালেসটাইন লিবারেশন আর্মির কমানডার পর্যন্ত হয়েছিলেন। ইরানেই যারা আত্মগোপন করেছিলেন তারা গড়ে তোলেন 'তেহেরান গ্রুপ'।

১৯৬৬ সালের শেষদিকে তেহেরান গ্রুপ আর মাসুদ আহাম্মদ আব্বাস মাফতাহি ও আমির পারভিজের নেইয়াম গ্রুপ এক সঙ্গে মিশে গঠন করে পিপল আরগানাইজেশন অব ফ্যাদিয়ান। মার্কস-লেনিনের আদর্শে বিশ্বাসী এই দল ১৯৭০ সালে ঘটায় সিয়াখাল অভ্যুত্থান। সিয়াখাল তেহেরান থেকে ৩৫ মাইল দূরের একটি গ্রাম। এই গ্রামেই ছিলো রাজধানী তেহেরানকে রক্ষা করার জন্যে একটি সামরিক ঘাঁটি। বিপ্লবীদের অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ দেয় ৬০ জন অফিসার সমেত বেশ কয়েক শ রাজকীয় রক্ষী। সেনাবাহিনী গ্রাম ঘিরে ফেলে। চলে জোর লড়াই। শেষে বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে যাওয়াতে নিহত হন প্রায় সবাই।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন শাহ রেজা মহম্মদ পহলবী। সত্তর দশকের প্রথমার্ধে ইরানে শ্মশানের শান্তি। আর সে শ্মশানে, শহরে আলো, নাচ, গান, আমোদ প্রমোদ। সর্বত্রই শাহর হাস্যোজ্জ্বল ফটোগ্রাফ।

কিন্তু আগুন ছিল ছাই-চাপা। ৭৭-৭৮ একটু একটু করে ছাত্র বিক্ষোভ রূপ নিলো বিস্ফোরণের অপেক্ষায় থাকা এক আগ্নেয়-গিরির। তারপরেই ঘটলো ৮ সেপটেম্বর



তেহেরানের বসবাস এলাকায় সাঁজোয়া গাড়ি

১৯৭৮ এর ঘটনা।

ইরানের ধর্মীয় নেতারা কখনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি। আয়াতুল্লা খোমেনিই প্রথম ধর্মীয় নেতা যিনি ইরানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে এক অসামান্য ভূমিকা নিয়ে ছিলেন ষাট দশকের গোড়া থেকেই। ইরানের অবিসম্বাদী ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা বজ সৈয়দ বেরুজারদির প্রিয় অনুগামী ভারতীয় বংশোদ্ভূত আয়াতুল্লা খোমাইনি। আয়াতুল্লা বেরুজারদি কখনো রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাননি। তার ইন্তেকালের পর সরিয়তির আসনে বসেন আয়াতুল্লা খোমাইনি। ব্যক্তি চরিত্রে অত্যন্ত কঠোর, মিতাচারী, কোরানের পথের একনিষ্ঠ পথিক।

১৯৬৩, জানুয়ারী। শিক্ষা ও ভূমি সংস্কার এবং সংবিধান সংশোধনের জন্যে ইরানে গণভোট ডেকেছেন শাহানশা। আয়াতুল্লা খোমাইনি নেমে এলেন রাজনীতির আসরে। ডাক দিলেন পূর্ণ অসহযোগের। '৬৩-র ৫ ও ৬ জুলাই ভূমিসংস্কার বিল নিয়ে বাঁধলো দাঙ্গা। রাজতন্ত্র এবং মোল্লাতন্ত্র দাঁড়ালো মুখোমুখি! খোমাইনি গ্রেফতার হলেন। গুজব রটলো তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। তাড়াহুড়ি অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা আয়াতুল্লা খোমাইনিকে 'ইমাম' উপাধি দিয়ে দিলেন। ইরানে 'ইমাম' উপাধিধারী কাউকে ফাঁসি দেওয়া যায় না। মুক্ত হলেন আয়াতুল্লা।

'৬৩-র অকটোবরে মজলিসে, ইরানে প্রবাসী আমেরিকানদের জন্য 'রক্ষাকবচ' আইন পেশ করা হলো। এ আইন পাশ হলে আমেরিকানদের পোয়া বারো। যে কোন অপরাধই তারা ইরানে করুক না কেন ইরানের কোন আইন তাদের কেশ স্পর্শ করতে পারবে না। প্রতিবাদ করলেন আয়াতুল্লা খোমাইনি। গ্রেফতার হলেন। দণ্ড হলো —নির্বাসন।

'৬৪-র ৪ নভেম্বর দেশ ছেড়ে চলে গেলেন আয়াতুল্লা খোমাইনি। প্রথমে তুরস্কে, তারপর ইরাকের নাজাফ শহরে কয়েক মাস কাটিয়ে চলে গেলেন ফ্রানসে। প্যারিসের শহরতলী নেপোলি-লি-চেটু-তে কতো না শান্ত প্রভাতে, কতো না বিধুর সন্ধ্যায় তিনি ভাবতেন তার পিতৃভূমি ইরানের কথা। ভাববাদীর বিলাসী ভাবনা নয়, স্বদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক কম্পনের খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। বিদেশে নির্বাসিত ইরানী নেতারা এসে আলোচনা করেছেন, এসেছে বিদেশে পাঠরত ইরানের ছাত্ররা, সেভকের চোখ এড়িয়ে, গোপনে। খোমাইনি তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আর অপেক্ষা করেছেন, কবে উপড়ে ফেলা যাবে আড়াই হাজার বছরের শাহানশাহীর তখৎ!

সারা দেশে চালু হলো সামরিক আইন, কিন্তু ৮ সেপটেমবর '৭৮ এর পর থেকে ইরানের মানুষ আইন-ছুট, গণ আন্দোলন পথ ধরলো সশস্ত্র লড়াইয়ের—অত্যাচারী শাহকে তারা হটাবেনই।

পত্র পত্রিকাগুলির ওপর সেনসরের কড়া বাঁধন, বন্ধ হয়ে গেলো দৈনিক পত্রগুলি। ছাত্ররা প্রকাশ করতে লাগলো নিষিদ্ধ বুলেটিন, সবার হাতে হাতে আগুন হরফে ছাপা প্রচার পত্র।

১০ অকটোবর বিশাল জনসভায় ন্যাশনাল ফ্রনট নেতা ডঃ করিম সনজাভি ঘোষণা করলেন: গণতন্ত্রই একমাত্র সমাধান। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ চাই। দলে দলে বিরোধী নেতা গ্রেফতার হলেন চললো গুলি।

খোমাইনি তখন প্যারিস থেকে দেশের জনসাধারণের প্রতি নির্দেশ দেওয়া শুরু করেছেন। প্রতিদিন দুপুরের নামাজের পর মসজিদগুলি থেকে মোল্লারা খোমাইনির ফরমান ঘোষণা করেন, পথে পথে নেমে আসে তাজোরত (মিছিল)। বন্দুকের মুখে বুক পেতে দেয় ছাত্র যুবা এমন কি মহিলারাও। সারা ইরান তখন একটি ধ্বনিতে কাঁপছে: খোমাইনি, খোমাইনি, রোবারেম্যান খোমাইনি।

নভেমবর '৭৮ এ আমি সারি শহরে, আমার কর্মস্থলে। সারা ইরান তখন উত্তেজনায় থরো থরো। একজন ইরানী আরেক ইরানীর সঙ্গে দেখা হলেই সালাম করে শাহর মৃত্যু কামনা করে: শাহ মুরদাবাদ। ট্রেন, বাস, বিমান—সমস্ত পরিবহন বন্ধ। সরকারি অফিসে বাতি জ্বলছে টিম টিম করে। শোধনাগারে ওঠে না এক ফোঁটা তেল। গর্দিস (ভ্রমণ) প্রিয় ইরানীদের গাড়ি ছোটে না ক্যাসপিয়ন কিমবা দাভাদানের স্কেটিং ময়দানে। রাস্তায় শুধু সামরিক বাহিনীর গাড়ি (ততোদিনে সামরিক বাহিনীতেও শাহ-বিরোধীরা তৎপর হয়ে উঠেছে) আর অ্যামবুলেনস। থেকে থেকে বন্দুকের শব্দ কাছে দূরে—প্রতিদিন, প্রতিদিনই।

আমি ডাক্তার, সেবাই আমার ধর্ম। হাসপাতালে হাসপাতালে হাজার হাজার আহত মানুষের ভিড়। সে দৃশ্য আগে কোথাও দেখিনি। কতো রক্ত! কতো মৃত্যু! ইরানী ডাক্তারদের সঙ্গে আমিও সেবা করে চলেছি আহত, বিপন্নদের। মধ্যরাত; ঘুম ভেঙেছে কলিং বেলের শব্দে—আহত সঙ্গীকে পিঠে করে নিয়ে এসেছে কয়েকজন ছাত্র, গুলি লেগেছে উরুতে। তক্ষুণি অপারেশন। ভোরবেলা চোখ খুলেছে ছেলেটি। আমার দুহাত আবেগে জড়িয়ে ধরেছে রাত জাগা ছেলের দল। গ্রেনেডে উড়ে গেছে এক তরুণীর হাত, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা মেয়েটির চোখের জল আমাকেও আর্দ্র করেছে। মানুষ দুহাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছে স্বদেশী ডাক্তারদের সঙ্গে আমার মতো খারেজি ডাক্তারকেও।—সে এক উত্তেজনাময় স্মৃতি।

পরিস্থিতি চলে গেলো চরম পর্যায়ে। শাহর পাশে শুধু কিছু আপনজন, বিদেশি বন্ধু বান্ধবী আর বিশ্বস্ত 'অমর সেনা বাহিনী।' নিভারণ প্রাসাদে তখন জোর তৎপরতা। রাজ-তন্ত্রের চিরবিরোধী মহান ডঃ মোসাদেকের একজালের দক্ষিণ হস্ত অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সাপুর বখতিয়ার, যেন হঠাৎই, রাজি হয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী হতে। অনেক কাঁটায় তৈরি সেই সিংহাসন, তাতে বসলেন কেন, কে জানে?

৬ জানুয়ারি '৭৯ বখতিয়ার গঠন করলেন মন্ত্রিসভা। ঘোষণা করলেন: শাহ চলে যাবেন দীর্ঘ অবকাশে। আস্তে আস্তে তিনি

তুলে নেবেন সামরিক আইন। প্রতিষ্ঠিত হবে গণতন্ত্র। সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজানো নয়, বখতিয়ার কিন্তু গারদে পুরলেন পুরোনো ঘুঘুদের, সাভকের কেষ্ট-বিষ্টুদেরও। বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা হলো। এমন কি সরকারীভাবে আয়াতুল্লাকে শ্রদ্ধা জানাতেও তিনি ভুললেন না।

অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ছাড়া বখতিয়ার সরকারের প্রতি কেউই সামান্যতম সমর্থন জানালেন না। প্যারিস থেকে খোমাইনি নির্দেশ দিলেন : ধর্মঘট চালিয়ে যাও, দিকে দিকে রাজতন্ত্রের শেষ শক্তিটুকুও নির্মূল করো। সেনাবাহিনীর একাংশ তখন হাত মিলিয়েছে জনসাধারণের সঙ্গে।

৮ জানুয়ারি ৭৯-তে প্রত্যক্ষ সংঘাতে বহু মানুষ মারা গেলেন সেনাবাহিনীর গুলিতে। সেনাবাহিনীতে শুরু হলো শাহ অনুগত এবং শাহ বিরোধীদের লড়াই। খবর রটলো বিমান বাহিনীর সেনারাও আছে জনসাধারণের সঙ্গে।

শাহের বিচার চাই। বখতিয়ারের পদত্যাগ—দাবিতে মিছিল, গণ বিক্ষোভ চলতেই লাগলো। সারা ইরানে গৃহযুদ্ধ। ইরানে আমেরিকার যেসব অস্ত্রঘাঁটি ছিলো, তালে তালে ততোদিনে আমেরিকা সরিয়ে ফেলেছে মধ্য প্রাচ্যের অন্য একটি দেশে। শাহের অবস্থা আরো সঙ্গীন।

১৫ জানুয়ারী '৭৯ প্যারিস থেকে খোমাইনি শিবির জানালো বৈপ্লবিক ইসলাম পরিষদ তৈরি, অস্থায়ী মন্ত্রিসভাও।

মা বোনকে আগেই আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ১৬ জানুয়ারি রাতের অন্ধকারে স্ত্রীকে নিয়ে শাহ উঠলেন নিজস্ব বিমানে। সঙ্গে এক বাকসো স্বদেশের মাটি। মিশরের সাদাত তাকে অভ্যর্থনা জানালেন কায়রোতে।

সে রাতে কেউ ঘুমোয়নি। তেহেরানে মানুষ শীত, বৃষ্টি, তুষারপাত উপেক্ষা করে আনন্দে মাতলো! সারারাত নাচ, গান আর বাজনা। টফি, লজেন্স, কেক, ফিরনির ছড়াছড়ি। রাস্তায়, ছাদে অলিন্দে চিৎকার : আল্লা হো আকবর, খোমাইনি জিন্দাবাদ। আয়াতুল্লা খোমাইনিকে দেশে আসতে দাও। 'সারবাজ ব্রাদারেম্যান খোমাইনি রোহাবারে ম্যান।'

এর পরের কয়েক দিনের ভেতর রাজধানী সহ আরও কয়েকটি কয়েদখানার দরজা খুলে দিতে বেরোলো মিছিল। বখতিয়ারের বাহিনীর সঙ্গে ঘটলো সংঘর্ষ। কিন্তু তখন ইরানের জনসাধারণ সমস্ত প্রশাসনের হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। তারা তখন অজেয়, দুর্বার।



মেয়েরাও নেমে এলো রাজপথে : শাহ দূর হটো

যুবক, ছাত্ররা সারাদেশ তোলপাড় করে খুঁজতে লাগলো সাভাক আর গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘের লোকেদের। রেফা বালিকা বিদ্যালয়ের চত্বরে লুটিয়ে পড়লো শাহর জবরদস্ত জেনারেলদের রক্তাক্ত দেহ। আবিষ্কৃত হলো তেহেরান শহরের পেটের মধ্যে এক গুপ্ত নগরী —কোমায়েট। জানা গেলো এই আতঙ্কের নগরীতেই বছরের পর বছর বন্দী করে রাখা হতো বিপ্লবীদের। মাটির নিচের সেলগুলিতে পাওয়া গেলো অসংখ্য নরকংকাল।

কাতারে কাতারে আবালবৃদ্ধবনিতা ভিড় জমালো সেই ভূগর্ভ নগরীতে যদি হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়!

জানা গেলো কারামত উল্লা দানেশিয়া, খুসরু গোলমারির মতো বিপ্লবীরা এই 'নগরীতেই' প্রাণ দিয়েছেন। নির্জন সেলের দেওয়ালে দেখা গেলো নখের আঁচড়ে নাম না জানা বন্দী কবি কবিতা লিখেছেন :

দরদ ও রনজে তাজিয়ানে/চন্দ রোজি বিস্ নিস্ত
রোজ দারে খালকগর/বাসি হামেসায় যুঁই॥
আপন ব্যথায় যে কাঁদে তার অশ্রু তুচ্ছ, হীন ;
জনতার শোকে যারা কাঁদে তারা অম্লান চিরদিন।

২২ জানুয়ারি প্যারিস থেকে খোমাইনি জানালেন : দেশে যাব, প্রতিষ্ঠা করবো ইসলামী সরকার। বখতিয়ার সরকারের আইনমন্ত্রী সাদেক ভজির্রি আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল জ্যাম পদত্যাগ করলেন।

এয়ার ইরানের ধর্মঘটী কর্মীরা এগিয়ে এলেন, জানালেন তারা নিয়ে আসবেন মুক্তিদাতা খোমাইনিকে। সরকার সায় দিলেন না। প্রতিবাদে উত্তাল হলো ইরান।

এয়ার ফ্রান্স বললো তারা নিয়ে আসবে আয়াতুল্লা খোমাইনিকে কিন্তু বিমানঘাটিতে নামবে কি করে? ইরানের পথে পথে ব্যারিকেড, আগুন আর গুলি। তেহেরান মাসাদ, ইসপাহান, সিরাজ, শাহি, সারি—সব কটি শহর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন।

হাসপাতালে জখম, গুলিবিদ্ধ মানুষ নিয়ে ব্যস্ত। মন খারাপ—তিন মাস কলকাতা থেকে একটা চিঠিও পাইনি। এরই মধ্যে ৩১ জানুয়ারি রেডিওয় শুনলাম : আগামী কাল এয়ার ফ্রান্সের বিমান আয়াতুল্লা খোমাইনিকে নিয়ে নামতে পারে দেশের যে কোনো বিমান বন্দরে।

১ ফেব্রুয়ারি এয়ার ফ্রান্সের বিমান মাটি ছুঁলো মেরাবাদ বিমান ঘাঁটির। ৩০ লক্ষ মানুষ শুধু একবার খোমাইনিকে দেখতে চায়।

বিমান ঘাঁটি থেকে হেলিকপটারে চড়ে খোমাইনি গেলেন তেহেরানের ১৭ নং প্লটে। সেখানে তৈরি হয়েছে বিরাট উঁচু মঞ্চ। খোমাইনি ভাষণ দেবেন। ইরানী বন্ধুদের সঙ্গে সে সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিলো।

কালো রংয়ের পাগড়ি, সাদা ধপধপে দাড়ি, ৭৮ বছরের বৃদ্ধ ধর্মীয় নেতা খোমাইনি সেদিন বললেন : শাহ রেজা পহলভীর সমস্ত কিছুই বেআইনি। বখতিয়ার সরকারও বেআইনি।

ইরানে ছিলাম এরপর মাত্র সপ্তাহ দুয়েক। 'বিদেশীদের পক্ষে ইরান মোটেই নিরাপদ নয়' হাওয়া বাতাসে এরকম রটছিলো বেশ কয়েক-দিন ধরে। কোনক্রমে প্লেনের টিকেট সংগ্রহ করেছিলাম। তারপর একদিন কাচের জানালায় ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেলো তেহেরান। কিন্তু সত্যিই কি মিলিয়ে গেছে? না। আজো মনে পড়ে তেহেরান বিশ্ববিদ্যালয়ের উড়োচুল চেকশার্ট গভীর চোখের ছেলেটিকে, যে বলেছিলো……। ★



ভারত-তিব্বত সীমান্তে

ভারত-তিব্বত সীমান্তে কয়েক ঘণ্টা

অমলেন্দু কুণ্ডু

গ্যাংটক থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ। তারপর জীপ থেকে যেখানে নামলাম সেখানে সামনেই বোর্ডে লেখা : 'আপনি কিন্তু শত্রুর নজরের মধ্যেই রয়েছেন'। অত শীতেও শরীরটা ঘেমে উঠল। সামনে অনেকগুলো পাহাড়ের চূড়ার উপর বাংকার। চূড়ার উপর গোল ঘর, সবটাই কাঁচ দিয়ে ঘেরা। জানতাম না…ওর সবগুলো ভারতের নয়। অনেকগুলোই তিব্বতের অর্থাৎ চীনা সৈন্যের হাতে। দেখলাম একটি গোলঘরের জানলা খুলে গেল। দু'জন চীনা সৈন্য বাইনাকুলার দিয়ে আমাদেরই লক্ষ্য করতে লাগল। বুঝতে পারলাম আমরা ওদের চোখের ওপরেই বিচরণ করছি।

একটা পাঁচিলের দিকে তাকাতেই বোঝা গেল ওটা টানা বাংকার। যার ফোকর দিয়ে বেশ কিছু স্টেনগানের মুখ আমাদের দিকেই উঁচিয়ে আছে।

শত্রুর হাতেই দাবা। একটা ট্রিগার টেপা বইতো না। একসঙ্গে এক ঝাঁক গুলি আমাদের ঝাঁঝরা করে দেবে। ভাবতেই শরীরটা আবার ঘেমে উঠল। মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠলো. মনে হলো আমার চলাফেরা, এমনকি আমার গলার স্বরও কারো সতর্ক নজরে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

১৪.২৬৮ ফুট উঁচুতে নাথুলা সীমান্তে ভারত ও তিব্বতের মোহনায় ভারত ও চীন সহাবস্থানের নীতি মেনে নিয়েছে। ওরাও নিশ্চিন্তে নিজেদের এলাকায় ভারতের বন্দুকের নলের ডগায় ঘুরতে পারে ; তেমনি পারে ভারতীয় সৈন্যরাও।

২৯ অকটোবর রাষ্ট্রপতি রেড্ডি গিয়েছিলেন নাথুলা সীমান্ত সফরে। সেখানে তিনি জওয়ানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।, তারপর হেলিকপটারে করে পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে সীমানার বেড়াজাল দেখার চেষ্টা করেন। কী অপরিসীম কষ্ট, কী ধৈর্য, কী বিপুল ব্যয়ে দুটি দেশ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে অহোরাত্র দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সৈন্যদের একবারের জন্য চোখের পলক পড়ে না।

নাথুলায় ভারতীয় সৈন্যের মূল পোসটে পৌঁছে দেখলাম একটা সড়ক ভারতীয় সীমানা পেরিয়ে সোজা তিব্বত সীমান্তে ঢুকে গেছে। কোথাও কোন বাধার প্রাচীর নেই। কিন্তু কেউই 'নো ম্যানস ল্যানডে' প্রবেশ করে না। দেখলাম ওপারে চার পাঁচজন বেঁটে বেঁটে চীনা সৈন্য গল্প করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ সিভিলিয়ান দেখে চীনা পোসটেও তৎপরতা বাড়ল। এ জানলা ও জানলা খুলে বাইনাকুলার দিয়ে তারা দেখতে বা বুঝতে চেষ্টা করল—কারা এরা? উত্তর দেবারও কেউ নেই। জবাবতো নয়ই। সবাই শুধু দর্শক আর নির্দেশের ভৃত্য।

কোন নির্দেশ নেই তাই নল উঁচিয়ে দেখে যাও। কিংবা তাদের গোয়েন্দারা হয়তো পাহাড়ের গায়ে কান লাগিয়ে শব্দ নিয়ে আগেই জেনেছে ভয় নেই, কিছু ভারতীয় সাংবাদিক এসেছেন সীমানা দেখতে।

ভারতীয় পোসটের ঘরা কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলাম : সামনে সেই বিখ্যাত নেহরু পিলার। ১৯৫২ সালে এই পথ দিয়ে নেহরু তিব্বত হয়ে ভুটান গিয়েছিলেন। যাবার পথে দুটি দেশের নেতৃবৃন্দের একটা বৈঠক এখানে হয়েছিল। তাকে স্মৃতি হিসাবে রাখার জন্য ওই পিলার। তার একটু পাশেই ভারতীয় গেসট হাউস। একটাই ঘর। বাড়িটির গায়ে সাদা জাফরির কাজ দেখলে শান্তিনিকেতনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই ঘরেই প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার দুটি দেশের পত্র-বিনিময় হয়। মেলব্যাগে নিয়ে দু'দেশের সৈন্যরা আসে। ওরা ওদের ব্যাগটা তুলে দেয়। এরা এদেরটা। মাত্র দু-তিন মিনিটের মিলন। একটু হাসি কিংবা সৌজন্য বার্তা ছাড়া কোনও কথা হয় না। যন্ত্রের মতন মানুষগুলো ফিরে আসে নিজের পিল বকসে। আবার নল উঁচিয়ে বসে পড়ে। যদি কোথাও এতটুকু সন্দেহ হয়, তাহলে খরগোসের মতন সজাগ হয়ে ওঠে।

ভারতীয় আর চীনা পোসটের ব্যবধান আমার-আপনার বাড়ির সীমানা বলতে পারেন। এত কাছে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। খুব বেশি হলে ১০/১৫ গজ।

কাছেই চীনের তৈরি প্রাচীর। পাঁচ-ছয়

ফুট উঁচু। কিন্তু তার মধ্যে দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সৈন্যরা যাতায়াত করে। ওই সুড়ঙ্গের পথে চার ছয় ফুট অন্তর অন্তর গোল ফোকর। যেখানে মুখ উঁচিয়ে শান্ত অথচ হিংস্র নল তাক করেই আছে।

ভারতীয় সৈন্যদের এই দুর্গম গিরি কন্দরে কিভাবে যে পাহারা দিতে হয়, তা না দেখলে বোঝা যেত না। শুধু এটুকুই বুঝেছি নির্ভেজাল দেশপ্রেম ছাড়া কোনও শক্তি সৈন্যদের প্রেরণা জোগাতে পারতো না। পাহাড়ের কোনও একটা খাদে একটা টিনের বাংকারের ছোট ঘরে সামনে চটের পর্দায় ঢাকা সৈন্যদের অতীব মনোরম বিশ্রাম কক্ষ। কাঁচা ঘরের সাইজ হবে, চওড়ায় পাঁচ ফুট লম্বায় আট ফুট। মাটিতে বালির আস্তরণ। তারমধ্যে লোহার দ্বিস্তর একটা খাটিয়া। ঠাণ্ডা বাতাস বইলেও দৃষ্টির ঘুলঘুলি কখনও চাপা পড়ে না।

সর্বত্র লেখা: 'আস্তে কথা বলো। ওরা শুনতে পাচ্ছে।' বাইরে এলেই শত্রুর নজরের মধ্যে ঘোরা।

অকটোবরেই তাপাঙ্ক মাইনাস এক। সারাদিনে রোদ যদি একবার দেখা যায়, তাহলে শুভদিন। নইলে শুধু মেঘের গায়ে নিজের ছায়া দেখা ছাড়া গতি নেই। তার উপর আছে হিমালয়ের বিখ্যাত শৈত্য প্রবাহ যা নাকি মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতি যখন জওয়ানদের সমাবেশে ভাষণ দিয়ে হেলিকপটারে চড়লেন, তার কিছু পরেই শুরু হলো একটানা তুষার বৃষ্টি। সারাটা রাস্তায় শুধু বরফের ছাট।

একটু পরেই সমস্ত জায়গাটা বরফে ঢেকে গেল। আমি পর্যটক; তাই আমার কাছে বড়ই মনোরম দৃশ্য। কিন্তু যারা দিনের পর দিন এখানে বাস করে, তাদের অবস্থা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলাম।

নাথুলায় হেঁটে উঠেছিলাম। হাঁফ ধরে গিয়েছিল। পথে কাটাঙ্গচু অর্থাৎ নদী দেখলাম।' জলঢাকার মূল জলস্রোত। বেশ বড় কয়েকটি লেক। একটাতে সিকিম সরকার মাছ চাষেরও ব্যবস্থা করেছে।

ভারতীয় সৈন্যদের কথায় ঘরোয়া আমেজ। এই পাহাড়পুরীতে প্রহরার দায়িত্ব নিয়ে এলেও, ভারতের কোণে কোণে যেখানে তাদের ঘর আছে, বন্ধু আছে সেখানকার কথা জানতে ওরা বড়ই আগ্রহী। ওরা রাজনীতি করেন না। ওরা জানেন না কে সিকিমের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ওরা খবর রাখেন নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছে, অন্ধ্রের ঝড় কিংবা জঙ্গীপুরের রেল দুর্ঘটনার কথা। ওরা জানতে চান অসট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত কেমন ক্রিকেট খেললো।

আত্মীয়তার সুরে ওদের অভাব অভিযোগ জানতে চেয়েছি। কেউ বলতে চায়নি। তবে কিছুদিন ধরে মাংসের কনট্রাকটর মাংস সরবরাহ না করায় ওরা যে ডিম খেয়ে রয়েছে তা জানলাম। তেমনি জানলাম ভাত রুটি ছাড়াও একটা করে জ্যামের টিন ওদের জোটে। এই ঠাণ্ডায় প্রতিদিন ওদের ভাগে এক পেগ মদ্য ড্রিঙ্ক। তার বেশি খেতে হলে সাত টাকা বোতল কিনে খাও। চা অবশ্য তিন-চারবার জোটে। যত পারো খাও। গরম জামার অভাব নেই।

একটানা পাহাড়ে থাকতে হয় না। অদল-বদল হয়, ছুটিতে বাড়ি যাওয়া যায়।

রাষ্ট্রপতি দুটি অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন, 'আমি জানি আপনাদের প্রয়োজন অনেক। কিন্তু দেশের অগ্রগতি তো বন্ধ করে কিছু করা যায় না। তবু প্রয়োজনে সরকার পিছপাও হবে না!' তিনি বললেন, 'সমগ্র বিশ্বযুদ্ধ বিজ্ঞানের আধুনিকতায় এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদেরও তালে তাল রেখে এগোতে হবে। এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা আমাদের ব্যয় করতেই হবে।'

নাথুলা পাহাড় থেকে নামতে নামতেই কুয়াশায় ভরে গেল চারিদিক। একটু স্বস্তি পেলাম। যাক চীনা সৈন্যরা আর আমায় দেখতে পারছে না। যদি ভুল করেও গুলি বেরিয়ে আসে, তাহলে হয়তো তা মিস করে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা অন্তত পালাবার কিংবা লুকোবার সুযোগ পাবো।

শত্রুর নজরের বাইরে এসে মনে হলো যেন কত নিশ্চিন্ত। তখনই দেখলাম ভারতীয় এলাকায় বাংকারের মধ্যে থেকে মেসিনগানের নল আমায় কিন্তু ছাড়েনি। তবু ভয় করলো না। কারণ ওরা তো আমাদের ভাই। ★ আলোকচিত্র: কে রাঘবন



ইনসটিটিউট অব টিবেটোলজিতে রাষ্ট্রপতি

পথ চলতি

ভোটরঙ্গ

রাস্তার উত্তর দিক থেকে হন হন করে একজন আসছেন ; তার ধুতি পাঞ্জাবী এবং টুপিতে যথেচ্ছ ছাপ মারা। তাতে লেখা, অমুকদাকে ভোট দিন। আর একজন আসছেন দক্ষিণ থেকে। দু'জনে মুখোমুখি হতেই কিছু কথা হল। পানের দোকানে জুৎসই একখিলির অর্ডার দিয়ে আমিও কান পাতলাম। কেন না, কৌতূহল বড় বিষম দায় !



দ্বিতীয় জন : কেমন আছ ? আরে একি, জামা-কাপড়ে খালি অমুকদাকে ভোট দিন। এটা নতুন টেকনিক নাকি ?

প্রথম জন : তা বলতে পার। অমুকদার আমি সর্বক্ষণের কর্মী। সভায়-টভায় এই পোশাকে যেতে হয়। অমুকদাই অর্ডার দিয়ে বানিয়ে দিয়েছে।

—বেশ বেশ। তা আমার দুই বেকার ছেলেকে অমুকদার পারটিতে নিয়ে নাও না। আহারে, এবার পুজোয় ওদের জামা-কাপড় দিতে পারিনি !

—না ভাই, সে গুড়ে বালি।—(দীর্ঘশ্বাস)।

—কি রকম ?

—আর বল কেন, পাঁচজনের কথায় অমুকদা নাম প্রত্যাহার করে বসে আছে। বাঙালী জাতটা এই করেই গেল। পরের ভাল দেখতে পারে না।—(পুনরায় দীর্ঘশ্বাস)।

—তাহলে খামোখা ওই ছাপটা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? এটা তুলে ফেললেই হয়।

—আরে সে চেষ্টা কি করিনি ? কিন্তু পাকা রং যে !

—তাহলে বল অমুকদার বুদ্ধিটাও বেশ পাকা।—(হাস্য এবং প্রস্থান)।

বিজনকুমার ঘোষ

নতুন ভাষা !

পানের দোকানে বিশেষ ভিড় ছিল না ; তবু দোকানী আমার কথা যেন শুনতেই পেল না। সে মন দিয়ে পান সাজতে লাগলো। আমার সামনে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। ওরা বোধ হয় আগে অর্ডার দিয়েছে।

অগত্যা অপেক্ষা। নজর গেল ওদের দিকে। দুটি মেয়েই শ্যামলা—একজন রোগা, একজন পৃথুলা। একজনের ব্লাউজ হাতকাটা, একজনের হাত-ওয়ালা। এবং কলকাতা শহরে, অনাগত সন্ধ্যায়, রোগা মেয়েটির একটি হাত ছেলেটির কাঁধে।

অতঃপর এই ধরনের সংলাপ শোনা গেল :

রোগা মেয়ে ছেলেটির প্রতি : আজ তুমি লালগোলায় এলে না যে ? আমি জায়গা ম্যানেজ করে রেখেছিলাম।

ছেলে—কি করবো বলো ! মা বললেন মাছ না খেয়ে উঠতে দেবেন না।

রোগা মেয়ে—বা-হ্। লক্ষ্মী ছেলে ! আর আমিএকা একা—

মোটা মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠল—তোরা মান-ভঞ্জনের পালা থামাবি !

ছেলেটি ওর দিকে ঘুরতেই ওর কনুই মেয়েটির বুক ছুঁয়ে গেল। মেয়েটির তাৎক্ষণিক মন্তব্য : শালা, এদিকে আবার হাত বাড়াচ্ছিস কেন ? একজনকে নিয়ে আছিস, তাই থাক।

মন্তব্য নিশ্চয়ই দরকার নেই। শুধু মনে হচ্ছিল—এ সংলাপ শোনা গেল কলকাতার রাস্তায় এবং বাংলো ভাষায় !

অলোক দত্ত

সবই অসাধারণ !

আমাদের পাড়ার প্রবীণ হারুকাকা বলেন, 'জানুয়ারি হল গারজেন আর বুক সেলারদের মাস।

'এখন গারজেন মানে ছেলে বা মেয়ের মা।



তারাই সারা বছর ছেলেমেয়েদের ইসকুলে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। বাড়িতে পড়া করায়। টিফিন নিয়ে যায়। পরীক্ষার সময় সাসপেনসে ভোগে। মিসদের বাড়িতে ডেকে খাইয়ে, দাইয়ে ইমপ্রেস করে। স্কুল ড্রেসের সঙ্গে মানানসই পুলওভার বোনে।'

এই অবধি শুনে হারুকাকার দাদা বললেন, 'আর একটা জিনিস দেখেছো হারু ? আজকাল সব ছেলে বা মেয়েই ফার্স্ট কিংবা সেকেনড হয় ! কোন সাধারণ ছেলেমেয়ে আজকাল আর নেই। জানুয়ারি মাসে তুমি দু'ধরনের গারজেন পাবে। একজন উজ্জ্বল মুখে বলবে, আমার ছেলেটা/মেয়েটা এবারেও ফার্স্ট হয়েছে। আরেকজন মুখ কালো করে বলবে, আমার ছেলেটা/মেয়েটা মাত্র দু' নম্বরের জন্যে সেকেনড হয়ে গেল। সাধারণ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা সব গেল কোথায় বলতে পারো ?'

নিবারণ চক্রবর্তী

ঝিয়ের খোঁজে

ঝি এক দিন বাসন মাজতে না এলেই বৌমাদের মুখ আষাঢ়ের প্রথম দিন। ছাই



শালপাতা নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে বাসন মাজা এই টি ভি ট্রানজিসটারের যুগে !

এদিকে ঝিয়েরাও সব মডার্ন হয়ে গেছে। হুটহাট কাজ ছেড়ে দেয়। পুজোর শাড়ি পাবার পর তো গণ পদত্যাগ। এ সমস্যায় পড়ে সেদিন পাশাপাশি দু-ফ্ল্যাটের দুই-বৌমা ঝি খুঁজতে বেরুলো। অনেক খোঁজাখুজির পর রাস্তার ওপরেই পাকড়াও হল একটি মেয়ে। আধময়লা বেশবাস। কিন্তু একেবারে অচেনা। অচেনা লোক রাখা কি ঠিক হবে ? এক বৌমা বললো : আরো দূর অচেনা ; যে জ্বালায় মরছি, হাতের ছাল চামড়া উঠে গেল বাসন মাজতে মাজতে। এখন রাজি হয় কি দেখি।

আমতা আমতা করে দু-বৌমা 'মেয়েটিকে বাসন মাজার অফার দিয়ে বসলো। মোটা মাইনে। জলখাবার। লাল হল মেয়েটির চোখ মুখ। দৃষ্টিতে আগুন। কিন্তু মেয়েটি নরম গলায় ছোট্ট জবাব দিয়েছিল : আমি কলেজে পড়ি।

সৌরেন মিত্র

ব্যঙ্গচিত্র : শান্তিপ্রী



ব্যাপক চুরি আর দুর্নীতি কয়লার কালো রঙকেও লজ্জা দিচ্ছে

কয়লা শিল্পে দিনে লোকসান কোটি টাকা

……ভেরি আনপ্লেজেনট বাট নেসেসারি ড্রাসটিক অ্যাকশন শুড বি টেকেন টু চেক লুজিং হানড্রেড অব ক্রোড়স অব রুপিজ এভরি ইয়ার ইন দি কোল ইনডাসট্রি……(৪ জুলাই '৭৯ / নেইভেলি / তামিলনাড়ু)

রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা শিল্প সম্পর্কে এই তিক্ত নিদান রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেডডির। এর কয়েকদিন আগেই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল কয়লা শিল্পের শোচনীয় চালচিত্র : রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার মাত্র ছ' বছরের মধ্যে লোকসানের পরিমাণ বছরে ৩৪২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দৈনিক লোকসানের পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা! অথচ এই সেদিনও অন্যতম লাভজনক বেসরকারী শিল্প হিসেবে চিহ্নিত ছিল কয়লা শিল্প। সেসবই অতীত। মাত্র ছ' বছরের 'ন্যাশনালাইজেসন'-এর তকমা এর বর্তমানকে এমন গভীর-অন্ধকারে পৌঁছে দিয়েছে যে ভবিষ্যতে আর দৃষ্টি চলে না। কিন্তু—

কিন্তু সেই সুদূর অতীতে বড়লাট ওয়ারেন হেসটিংসের দেওয়া ব্যবসায়ের পাট্টা হাতে যে ইংরেজ তনয় প্রথম খনি থেকে কয়লা তোলার সূচনা করেছিলেন তার দূরদর্শনে ভ্রান্তি ছিল না। ১৭৭৪-এ রানীগঞ্জে যে শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল সস্তার জ্বালানি হিসেবে অচিরেই তার কদর বেড়েছিল। কয়লা হয়ে উঠেছে কালো হীরে। আর এই হীরের খনির ব্যবসা রানীগঞ্জ, ধানবাদ, ঝরিয়া রাঁচি, গিরিডি, নাগপুর, সিঙ্গারেনি, মারঘারিটার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে। ঐশ্বর্যের চমক ঠিকরে পড়েছে বেঙ্গল কোল কোমপানি, অ্যানড্রু ইয়ুল, ম্যাকিনন ম্যাকেনজি থেকে হালফিলের কোলিয়ারি মালিকদের রাজকীয় ঠাট ঠমকে। সে সবই অতীত কথা।

অতীত কথাই। কারণ ১৯৭১ এর অকটোবরে কোকিং কোলের পরিচালন ব্যবস্থার আংশিক রাষ্ট্রায়ত্ত করণে যে সরকারী অধিগ্রহণ পর্বের শুরু 'কোল মাইনস ন্যাশনালাইজেশন অ্যাকট ১৯৭২' মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটল দেশের সবগুলি কয়লাখনির জাতীয়করণে। ৩০ জানুয়ারি ১৯৭৩ থেকে ভারতের কয়লা শিল্প সম্পূর্ণ সরকারী পরিচালন কর্তৃত্বে আসে। বেসরকারী খনি মালিকদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হয় ৩০ কোটি টাকা।

১৯৭৫-এর ১৯ সেপটেমবর গঠিত হল কোল ইনডিয়া লিমিটেড। চারটি সাবসিডিয়ারি কোমপানি : ভারত কোকিং কোল লিমিটেড, ইসটারন কোল ফিলড লিমিটেড, সেনট্রাল কোল ফিলড লিমিটেড এবং ওয়েসটারন কোল ফিলড লিমিটেড ছাড়াও এন সি ডি সির সুদামডি ও মনিডি খনি অঞ্চল কোল ইনডিয়ার সার্বিক পরিচালন আওতায় আসে।

কিন্তু এই জাতীয়করণ নামক ব্যাপারটিতে লাভ হল কার? সাধারণ মানুষের? রেল, সার কিংবা ইসপাত কারখানার? কয়লা নির্ভর ভারতীয় অর্থনীতির? এর সবকটির জবাব একটিই—না। লাভ যাদের হয়েছিল তাদের কথায় পরে আসছি। রাষ্ট্রীয়করণের প্রথম

অজয় বিশ্বাস

ধাক্কাতেই কালো হীরে আরও দামী হল। দাম বাড়লো কয়লার একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার। অজুহাত একটিই : উৎপাদন ব্যয় আর বিক্রয়মূল্যের সমতা থাকছে না। তাই—

উঠতি মূল্যে পত্তনে যে ভবিষ্যতের চিত্র এঁকেছিল তার রঙও কয়লার মত। কালো। নিকষ কালো।

যে অসমতা প্রথম দিনগুলিতে গ্রাস করেছিল তা আজও অব্যাহত। অব্যাহত লোকসানের পৌনঃপুনিক ধাক্কা। যে কয়লা বেসরকারী মালিকানার দিনগুলিতে হীরের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল আজ তার সর্ব অঙ্গে মলিন দীনতার ছাপ।

এই লাভ থেকে লোকসানে অবনমনের কারণ খুঁজতে গিয়ে একদা উঁকি ঝুঁকি মারতে হয়েছিল 'কোল ইনডিয়া লিমিটেড'-এর সদর

প্রাইভেট মাইনিং

আগুন।

আগুন, আগুন আর আগুন।

আসানসোল থেকে ফিরতি পথে সন্ধ্যের গভীর অন্ধকার পটভূমিতে আগুনের শিখা দেখে ভেবেছিলাম কুলটির ইসকোর আগুন। কিন্তু ভুল ভাঙলো সঙ্গী সাংবাদিক বন্ধুর কথায়ঃ প্রাইভেট মাইনিং। বেআইনীভাবে খনি থেকে কয়লা তুলে তা পুড়িয়ে রাতের অন্ধকারে লরি বোঝাই করে পাচার করা নিত্যদিনের ঘটনা। লাখ লাখ টাকার কয়লা সকলের চোখের উপরেই পাচার হয়ে যায়। এ আগুন ঐ কয়লা পোড়ানোর!

রাষ্ট্রায়ত্ত করার সাতটি বছর পরেও প্রাইভেট মাইনিংয়ের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে ই সি এল সি সি এলের কয়লাক্ষেত্র জুড়ে। কয়লাক্ষেত্র-গুলির উৎপাদন অবনমনের সুযোগে শূন্যস্থান পূরণে সদা তৎপর এইসব খনির মালিকরা। সি সি এলের সতীঘাট, ধোবীডি, ভাদুয়া, কামারশাল প্রভৃতি অঞ্চলে ১৯৭৬ থেকে অনেকখানি প্রকাশ্যে এবং বিস্তৃতভাবে এইসব খনির ব্যবসা মাথা চাড়া দিয়েছে। হরিয়ানা, পানজাব, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা লরির মিছিলে গিরিডির বাজার সরগরম। টন পিছু ২৫০-৪০০ টাকায় কয়লা বোঝাই লরি পাড়ি দিচ্ছে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। পুলিশ, খনি কর্তৃপক্ষ আর এক শ্রেণীর অসাধু রাজনৈতিক নেতাদের যোগ সাজসে এই ব্যবসা চালু রেখেছে বেআইনি খনি মালিকরা। মাঝে মাঝে লোক দেখানো পুলিশী তৎপরতা চলে। তারপর গড্ডলিকা প্রবাহ আবার বহতা—

শুধু কি সি সি এল? প্রাইভেট মাইনিংয়ের দুনম্বরী কারবারে সকলকে টেক্কা দিয়েছে ইসটারন কোল ফিলডের কালোহীরের কারবারীরা। কুলটির ভিকটোরিয়া কোলিয়ারির কাছে বড়রার বেকানুনী খনির কথা শুরুতেই বলেছি। রসুলপুর, গোরানডি, বারাবনি ভানোরা, শংকরপুর সব এলাকাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে জমজমাট ব্যবসা চলছে ই সি এল প্রশাসনের চোখের উপরে। লরির পর লরি কয়লা বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে পুলিশের আর খনি নিরাপত্তা বাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে। যারা জেগে ঘুমান তাদের ঘুম ভাঙায় এমন সাধ্য কার?

'প্রাইভেট মাইনিং-এর এমন ফলাও কারবার জিইয়ে রেখেছে বিভিন্ন কোলিয়ারির এজেনট জি এমরা। এই লাভের একটা বখরা পান সাঁকতোরিয়া বড়কর্তারা। মাঝে মাঝে লোক দেখানো লরি আটকানো ছাড়া এরা আর কিছুই করেন না।' দুঃখ করে বলেছিলেন আসানসোলের এক তরুণ সাংবাদিক। ওর কাছে খবর পেয়ে গিয়ে-ছিলাম বরাকরের কাছেই একটি বেআইনি খনিতে। গোলাপী কাগজে ছাপা রসিদ দিয়ে কয়লা বিক্রি হচ্ছে মাত্র তিনশ টাকা টন!

কিন্তু কারা চালায় এই ব্যবসা? এ প্রশ্নের জবাব মিললো ৯ অকটোবর ৭৯ তারিখে করা একটি গণ দরখাস্তে। নিউ পাড়া হোসিপাহাড়ির (ই সি এল-এলাকাভুক্ত) সাধারণ মানুষ খনি ও শক্তি মন্ত্রীর কাছে বিল্লা গ্রামের কুখ্যাত সমাজবিরোধী বাবু রায় এবং রামপুরের শেখ সদরুদ্দিনের বিরুদ্ধে বেআইনি খনি চালু করে দিনে ৭০-৮০ হাজার টাকার কয়লা পাচারের অভিযোগ এনেছেন।

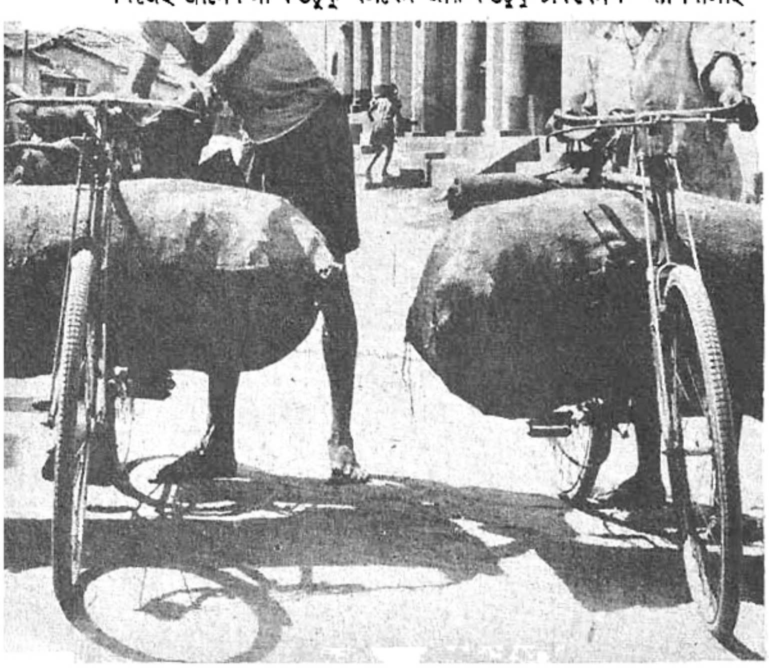
অবশ্য শুধু সমাজবিরোধীরাই যে এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তা নয়। সারফেস রয়্যালটি, আনডারগ্রাউনড রয়্যালটির আইনি তকমা হাতে নিয়ে আর এক শ্রেণীর লোকও এই কারবারের মধু লুটছে। আর কয়লার চেয়েও কালো এইসব লোভী হাত মাটির নীচে বয়ে যাওয়া কয়লার শিরায় যত্রতত্র নির্মম ছুরি চালাচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নতুন 'সীম' খোলার পথ।

ভারতের কয়লাক্ষেত্র জুড়ে প্রাইভেট মাইনিংয়ের ছিদ্র পথে কোটি কোটি টাকার কয়লা পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। এহ বাহ্য, কিন্তু প্রাইভেট মাইনিং নামক লালসা কয়লাখনি শিল্পের বিকাশের পথ স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। চিন্তা সেখানেই।

দফতরে। ইচ্ছে ছিল 'শাই পাবলিক সেকটর' বিশেষণ বিভূষিত সি আই এল'র চেয়ারম্যান আর এন শর্মার ভাবনা চিন্তার তত্ত্বতালাশ। কিন্তু হতাশ হলাম।

ঃ মিঃ শর্মার দেখা পাননি বলে হতাশ হচ্ছেন? চিন্তার কিছু নেই —আশ্বস্ত করলেন সি আই এল-এর এক প্রবীণ অফিসার—

'দেখা মিললেই বরং আরও বেশি হতাশ হতেন। কারণ তিনি নিজেই জানেন না কতটুকু বলবেন আর কতটুকু ঢাকবেন। ন্যাশনালাই-



সাইকেলে কয়লা পাচার/ অজয় বিশ্বাস

জড কোল ইনডাসট্রির সর্বত্রই এক অনিশ্চয়তার অ্যাটমোসফিয়ার। এই শিল্পের নীতি নির্ধারক এখন রাজনীতি। প্রশাসকদের কেউই মন্ত্রী অথবা নেতাদের মন না রেখে কাজ করতে পারেন না। পান থেকে চুন খসলেই অস্তিত্বের সংকট! সুতরাং গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়েই বা উপায় কি?'

তাছাড়া দেখুন সাংগঠনিক বিকেন্দ্রীকরণের পুরো ব্যাপারটাই জগাখিচুড়ি মার্কা। সবকিছুই এখন ওপেন টু অল। আশ্চর্য এক ঢিলে ঢালা চলছে চলবে ভাব। এ জিনিস আগে ছিল না।

তাই আজ সি আই এল-এর অবস্থা পরিবারের পঙ্গু অভিভাবকের মত। সংসারের হট্টগোলে যার কণ্ঠস্বর শুধুই হারিয়ে যায়। সি আই এল কার্যত পরামর্শদান সংস্থা মাত্র—সুষ্ঠু কেন্দ্রীয় নীতির অভাবে বিভিন্ন কোল ফিল্ড কর্তাদের ডোনট কেয়ার মনোভাবের শিকার! একে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে আঞ্চলিক কর্তারা তাদের বাদশাহী চাল দিব্যি বজায় রাখছে! এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি লোকসানের পৌনঃ-পুনিক বৃদ্ধি আর তা সামাল দিতে কয়লার দাম গগনমুখী।

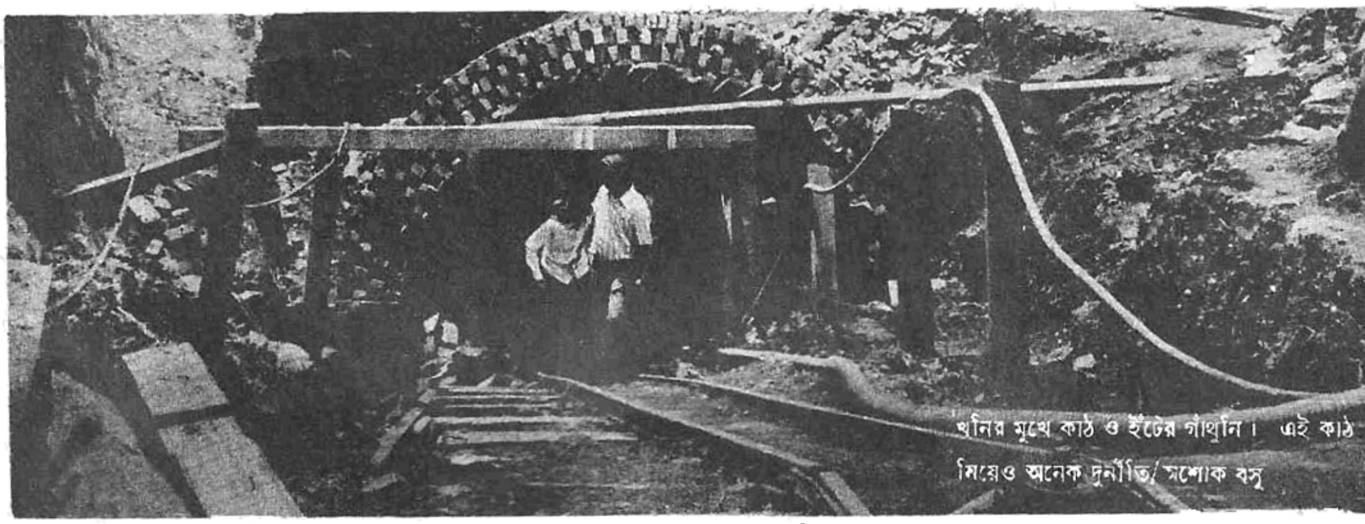
আর এই লোকসানের মাত্রা আজ এমন এক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকেও 'আনপ্লেজেনট বাট নেসেসারি ড্রাসটিক অ্যাকশন' নেওয়ার বিষণ্ণ পরামর্শ দিতে হয়।

রাষ্ট্রপতি চিন্তিত। শুধু চিন্তিতই নন, শংকিতও। কারণ তিনি রাষ্ট্রপ্রধান। তাবৎ জাতীয়কৃত ব্যাপার স্যাপারের সঙ্গে এই পদমর্যাদার যোগ বড় নিবিড়। তাই তার এই মন্তব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্যই নয়, প্রণিধানযোগ্যও বটে।

কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবেন কে? কে নেবেন এই 'আনপ্লেজানট অ্যাকশন?' না, এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই। না ঘরকা না ঘাটকা এই কয়লা শিল্পের অনেক উপরতলার মন্ত্রী থেকে

প্রশাসনিক আমলা কিংবা ইউনিয়নবাবু থেকে লোডিং লেবার কারো এতটুকু মাথাব্যথা দেখিনি এই ক্রমবর্ধমান লোকসান আর উৎপাদন অবনমনের সংকট নিয়ে। দিনে এক কোটি টাকা লোকসান দিলেও ই সি এল-এর সাঁকতোরিয়ার সদর দফতরের নবনির্মিত 'রাজপ্রাসাদে' অবহেলায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বসে, 'সি আই এস এফ'র সঙ্গে 'বেওস্তা'র গুণে লাখ টাকার হলেজ মেশিনের তামার তার চুরি হয়ে যায় বিশ-পঁচাশ রুপেয়ায়। পারচেজের বড়বাবু ভাবলেশহীন মুখে সঙ্গীকে বলেন, 'পেমেনট বাকি তাই গোমিয়া একসপ্লোসিভ সাপলাই করবে না। শালা প্রোডাকশন কি—আসবে?'

'কোল ইনডাসট্রির ন্যাশনালাইজেশনের ব্যাপারটাই করা হয়েছিল তাড়াহুড়ো করে। কোন পারকল্পনা ছিল না, বাস্তব কোন ধারণাও ছিল না। তাই অধিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একরাশ জটিলতার জালে জড়িয়ে পড়লো কয়লা শিল্প। আর এই জটিলতার নীট ফল এক সর্বগ্রাসী নৈরাজ্য। কি পুবে, কি পশ্চিমে সর্বত্রই এই নৈরাজ্যের ছাপ।' আসানসোলের প্রবীণ সাংবাদিক সত্য কর্মকার আক্ষেপ করে বলছিলেন, 'আর এই নৈরাজ্য সবচেয়ে বেশি প্রকট ইসটারন কোলফিলডে। সাঁকতোরিয়ার মূল সাম্রাজ্য ঘিরে ১৮৬টি কোলিয়ারির মিনি সাম্রাজ্যের বিস্তার! বিলাসে-ব্যসনে ই সি এল-এর এজেনট, জি এম থেকে এরিয়া ম্যানেজারেরা লজ্জা দেন বাদশাহী বিলাসকে!'



খনির মুখে কাঠ ও ইঁটের গাঁথুনি। এই কাঠ নিয়েও অনেক দুর্নীতি/ অশোক বসু

সাম্রাজ্য? তা সাম্রাজ্যই বটে। রাণীগঞ্জ-সালানপুর কোল ফিলড ছাড়াও বিহারের মগমা, সাঁওতাল পরগণার দুমকা, ধাদকা এবং পালমাটিয়ার কাছে রাজমহল ও সি পি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভারতের বৃহত্তম কয়লা ক্ষেত্র ইসটারন কোল ফিলড লিমিটেড। ই সি এল। কয়লাক্ষেত্রের দুর্মুখেরা বলেন ইটিং চিটিং লুটিং এই তিনে মিলেই ই সি এল।

কোন রাজ্যে কত কয়লার ভাণ্ডার
(১০ লক্ষ টনের হিসেবে)

	প্রুভড	ইনডিকেটেড	ইনফারড	মোট
পশ্চিমবঙ্গ	৪,০৩৮.৩৬	৫,৯৯৪.৮৯	৯,৫৮৫.৬৫	১৯,৬১৮.৯০
বিহার	১০,৫৯০.২৮	১৬,১১৮.২৩	৮,৫২১.৬০	৩৫,২৩০.০০
মধ্যপ্রদেশ	৪,২৬৪.৫৫	৪,০৬৭.৪৯	৭,১৬৮.৪০	১৫,৪৮২.৪৪
ওড়িশা	৮৯৫.৪০	২,৪১৭.৯৬	১,৮১০.১২	৫,১১৬.৪৮
মহারাষ্ট্র	৪৭৭.৮৬	৭৯৯.৭৩	১,৩৪৪.০৬	২,৬১৭.৬৫
অন্ধ্রপ্রদেশ	৯৭৭.৯৫	১,০৭৭.১৮	—	২,০৫৫.১৩
আসাম, মেঘালয় অরুণাচল এবং নাগাল্যানড	১৩৯.০০	২৯০.৬০	৩৯৮.০০	৮২৭.৬০

রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা শিল্পের ক্ষতির বহর

কোন বছর	কত ক্ষতি
১৯৭৫-৭৬	২৭.৯৩ কোটি টাকা
১৯৭৬-৭৭	৪৫.৪৮ কোটি টাকা
১৯৭৭-৭৮	৮৯.৭৭ কোটি টাকা
১৯৭৮-৭৯	১৮২.০০ কোটি টাকা

১৯৭৯-এর ১৭ মে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বেতন হার পুনর্বিন্যাস হওয়ার পর উৎপাদন ব্যয়-বিক্রয় মূল্যের ব্যবধান টন-পিছু ৩২ টাকা। দৈনিক লোকসান আনুমানিক ১ কোটি টাকা। কয়লার দাম বাড়ানোর মাধ্যমে ৩৫০ কোটি টাকা বাড়তি এলেও ১৯৭৯-৮০র মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা হবে।

'চুরি? ইখানে চুরি তো দিন দুপুরে চইলছে। বালি ভইরাতে চুরি, শাল বল্লায় চুরি, লোডিংয়ে চুরি। আর ইসব চুরির কথা তো সবাই জানে। কিছু বলে না কেউ!' আসানসোল থেকে সাঁকতোরিয়ার পথে কোলিয়ারির এক নাম-না-জানা শ্রমিক বলেছিলেন, 'চুরি আমরাও করি। কাজে এক ঘণ্টা পরে যাই কিংবা কোন দিন ছুটি হওয়ার একঘণ্টা আগে খাদান থিকে উঠে আসি। কিন্তুক—

বাস থেকে গন্তব্যে নামার আগে বললে, 'কিন্তুক সায়েবরা সব পুকুর চুরি কইরছে। ইসেলে লুটের রাজত্ব চইলছে……'

এই লুটের রাজত্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উৎপাদন। শীতলপুরের বাগান বাড়িতে (রেসট হাউসে) সাংবাদিকদের ঢালাও আদর আপ্যায়ন করে যে সব প্রগ্রেস রিপোরট তুলে দেন কর্তারা তার সঙ্গে প্রকৃত চিত্রের ফারাক আজ আর অজানা নেই কারুরই। '৭৯ র ৩১ জুলাই তারিখ আঁকা ই সি এল-এর প্রেস হ্যানডআউট দেখিয়েছিলাম খনি নিরাপত্তা বিভাগের শ্রী শংকরণকে। ৭৯-৮০ উৎপাদন লক্ষ্য ২৬.০৬ মি টন। এর আগেরবারের চেয়ে অনেক বেশি বলে আশা প্রকাশ করেছেন কর্তৃপক্ষ।

আমার কথায় হেসে উঠলেন তিনি, 'একমাত্র সিঙ্গারেনি ছাড়া আর কোথাও এক টনও প্রোডাকশন বাড়েনি। ফ্রম একজিসটিং মাইন বলে যে ফিগারটি দেওয়া আছে টোয়েনটি পয়েনট জিরো টু মি.টন দ্যাট ইজ প্রবাবলি কারেকট ফিগার। রেসট আর বোগাস।'

একথা শুধু শংকরণের মত পদস্থ সরকারী কর্মীরই নয়। একই কথা বলেছেন ঘনশ্যাম কোলিয়ারির এক প্রবীণ কর্মী, 'বুক স্টক আর ফিজিক্যাল স্টকের মিল কোনদিন পাবেন না। প্রতি মাসের প্রোডাকশন মিটিংয়ে এদের 'কোটা' নির্ধারিত হয় এবং খনিতে উৎপাদন না বাড়লেও খাতা কলমে উৎপাদন বাড়িয়ে প্রোডাকশন ইনসেনটিভ বোনাসের নামে সরকারী অর্থের অপচয় হয়। এবারে

কয়লা ঃ কোলিয়ারি থেকে ডিপো

কয়লা। কালো হীরে।

কয়লা এখন সত্যিই হীরের মতই দামী। দুর্লভও।

তাই কোলিয়ারি থেকে ডিপো পর্যন্ত পৌঁছতে হাজারো হাতের (অবশ্যই বাম হস্তের) দাবি মিটিয়ে কয়লা হীরের চেয়েও দামী হয়ে পড়ে।

'ইউস কোল ঃ ইনডিয়া'জ চিপেসট ফুয়েল।'

কোল-ইনডিয়ার বিজ্ঞাপনটিকে নিছক ব্যঙ্গ বলে মনে হয়। সরকারের বহু ঘোষিত মূল্যে কয়লা মেলে না কোথাও—খোদ খনির শহর আসানসোলেও নয়। ৪০ কিলো সাপটা কয়লার দাম চোদ্দ টাকা থেকে আঠারো টাকায় ওঠানামা করে প্রায়শই।

কারণ ?

কারণ কয়লার ব্যবসায়ের সবটুকু কয়লার মতই কালো হাতে নিয়ন্ত্রিত।

কয়লা আনার হাজার ট্যাকস ঃ কিভাবে বেড়েছে

১৯৭৪ ঃ কোলমাইন লেবার ওয়েলফেয়ার, রেসক্যু সেস, 'স্টলিং' ডিউটি, ব্রেকিং চার্জ ইত্যাদি নিয়ে টন পিছু ২·৪৫ টাকা এর সঙ্গে যুক্ত হত সেনট্রাল সেল ট্যাকস শতকরা ৩ টাকা করে।

১৯৭৫ ঃ বাড়তি যোগ হল বিহার সেলট্যাকস (মগমা ফিলডে) শতকরা ৪ টাকা রোডসেস টন পিছু ০·৩৮ পঃ এবং বি এইচ সেস ০·৩৪ পঃ/টন।

১৯৭৬ ঃ ফেবরুয়ারিতে যোগ হল আর টি সি ২·৬৭টা/টন এবং মে মাসে এল ডিউটি ২·৪৩টা/টন আর সেপটেমবরে সেস রয়্যালটি ১·৮৬টা/টন।

১৯৭৮ ঃ মারচে সেনট্রাল একসাইজ ডিউটি ৬·৬৭ টাকা/টন এবং মে মাসে তা বেড়ে হয় ৭·৭০টা। টন পিছু। এর সঙ্গে জুলাইতে যুক্ত হল জে এম বি সি এইচ নামে প্রতি টনে ২০ পয়সা অতিরিক্ত কর। যা অকটোবরে বেড়ে হয় ৪০ পঃ/টন।

১৯৭৯ ঃ জানুয়ারি মাসে এইসব হাজারো নামের ট্যাকসের মিছিলে যোগ দিল টন-পিছু ৯৩ পয়সার এল ডি সি সি।

বি এস টির ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতির বালাই নেই ! একই মাসে কখনও ৪ শতাংশ কখনো বা ৮ শতাংশ হারে টাকা নেওয়া হয়েছে। শুধু কি কয়লার উপর ? সেল ট্যাকস নেওয়া হয়েছে লেবার ওয়েলফেয়ার সহ যে কোন ডিউটির উপরও ! কয়লার মত এই চালানও বড় অন্ধকার, বড় রহস্যময়।

সাব ডিভিশনাল কনট্রোলারের ইস্যু করা পারমিট আর লগ বুক নিয়ে প্রথমেই আসতে হয় আসানসোলে অ্যাসিসট্যানট ডাইরেকটর কনজুমারস গুডস অফিসে। এখানকার চেকিং পর্ব শেষ হলে পারমিট জমা দিতে হয় সাব এরিয়া অফিসে। সিরিয়ালের জন্যে।

শুরু হল ঘুষের খেলা। একশজনের পিছনে এলেও ক্ষতি নেই। দশ থেকে একশ টাকার দক্ষিণার গণে—।

এর পরই ডি ও কাটা। কোলিয়ারি বাছাই। জেলাওয়ারী বিভিন্ন গ্রুপের কোলিয়ারি থেকে ভালো কোলিয়ারির ভালো মাল নেবেন ? সে 'বেওস্তা' করার জন্যে রামভজন কিংবা অমৃতলালেরা সদা তৎপর। স্রেফ গাড়ি পিছু ৬০-১২০ টাকা গুঁজে দিলেই বাজনা কোলিয়ারি মগমার দরজা খুলে দেবে।

কাঁটাবাবুর কাছে আসুন। ভাবলেশহীন চোখে খালি লরি ওজন করে দেবেন 'ওয়ে ব্রিজে'। না ইনি খালি লরিতে কিছু নেন না।

এবারে লোডিংবাবু!

কোন পিটে কেমন কয়লা সবই এর নখদর্পণে। ভালো কয়লার পিট থেকে কয়লা লোড করবেন ? বাবুর সন্তোষী লরি পিছু বিশ থেকে পঞ্চাশ। যেমন গুড়…

'কি বাবু, খুশি করবি তো…' আগে লোডিং লেবারদের সর্দার লরি পিটে এলে এরকম কথা ছুঁড়ে দিত। লরি পিছু দশ-পনেরো দিলেই সেলাম ঠুকতো। এখন ? লরি প্রতি ১৫০-২০০ টাকা 'বখশিস' ওদের হকের পাওনা। না দিলে লোড হবে না। আর একদিন লোড না হলেই লরি মালিককে ডেমারেজ দিতে হবে নীট ১২০ টাকা। প্রতিবাদ করবেন ? 'লাল ঝাণ্ডা' উড়িয়ে আওয়াজ উঠবে 'কাম বনধ'। আসবেন শ্রমিক নেতা.মালিক শ্রেণীর শোষণ, কালোহাত, মজদুর এক হও…ভাষণ দেবেন। ঝক্কি মুক্ত হতে হলে তাকেও কিছু ধরে দিতে হবে (পারটি ফানড !)। সুতরাং মেহনতি মজদুরদের হাড়িয়া গেলা কিংবা ঝোপড়িতে গিয়ে আসনাইয়ের জন্যে 'বখশিস' দিতেই হবে।

কয়লা বোঝাই লরি নিয়ে আবার কাঁটাবাবু। ওজন হবে। কয়লা কম/বেশি হলে পিটে ফিরে গিয়ে কয়লা তুলে/ফেলে ওজন ঠিক করাটাই আইন। এই মুস্কিলের আসান করেন কাঁটাবাবু। ওয়ে ব্রীজের পাশেই কয়লার পাহাড়। কম হলে এখান থেকে নাও আর বেশি হলে এখানেই নামাও। তবে—

তবে কম তুলুন, বেশি কিংবা ঠিক ওজনই তুলুন কাঁটাবাবুর জন্যে লরি পিছু মাত্র দশ টাকা। কারবার তো একদিনের নয়—

এবার ফেরার পালা। কোলিয়ারি অফিসে। কাগজপত্র ঠিক করে 'চালান' নেওয়া। এখানেও লরি পিছু মাত্র গোটা বিশেক টাকা প্রণামী না দিলে তীরে এসে চড়ায় আটকে যাবার সম্ভাবনা সেনট পারসেনট। সুতরাং—

সব শেষে দরওয়ানের চা-নাস্তার খরচ (প্রতি লরি ৫টা) দিয়ে রওনা দেওয়া শহর থেকে শহরে। ডিপোর উদ্দেশ্যে।

কিন্তু জিজিয়ার পালা কি শেষ হয় ? যেসব লরিতে কয়লা পরিবহন হয় তার বেশির ভাগেরই বহন ক্ষমতা নির্ধারিত ৬-৭ টনে। কিন্তু এক লরি কয়লার ওজন মাত্র ১২ টন। সুতরাং রাস্তায় দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিশের লম্বমান হাতে গুঁজে দেওয়া খুচরো পয়সা—তার পরিমাণও একশ মুদ্রার কম হবে না।

হাজার রকম জিজিয়া করের ধাক্কা সামলে কয়লা ডিপোতে পৌঁছে হয়ে যায় কালো হীরে। আর সেই হীরের টুকরো কিনতে গিয়ে মাথায় হাত পড়ে আমাদের।

নজির সৃষ্টি করেছিলেন প্রাক্তন সি এম ডি রামাইয়াজি ভারমা। সেই বোনাসের সিংহভাগই নাকি আত্মসাৎ করেছেন সেইসব জি এম, এ এম সাহেবরা যাদের উপর সই সাবুদ বিহীন এই অর্থ বণ্টনের দায়িত্ব ছিল।

ফিজিক্যাল স্টক ভেরিফিকেশন করে স্টকে বুক স্টকে তোলার কাজ কস্মিনকালেও করা হয় না। তাই পিট হেডে কয়লা না থাকলেও খাতায় উৎপাদন বেড়ে চলে হামেশাই।

কাগজ কলমে উৎপাদন বাড়ছে।এহ বাহ্য। আরও বড় গোঁজামিল দেওয়া হয় চুরির কয়লার হিসেব মিলাতে গিয়ে। প্রতিদিন ই সি এলের বিভিন্ন কোলিয়ারি থেকে ট্রাক কে ট্রাক কয়লা চুরি হয়ে পাচার হচ্ছে খনি নিরাপত্তা কর্মী আর একশ্রেণীর লুটেরা কর্মীর যোগসাজসে। ভানোরা এলাকায় এমন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এই প্রতিবেদক নিজেই।

এই চৌর্যবৃত্তির আবার রকম ফের আছে। শ্যামসুন্দর কোলিয়ারিতে কর্মীদের জন্যে ইস্যু করা ভুয়া কোল কারডের ছিদ্র পথে প্রতি রাতে ৮/১০ লরি কয়লা পাচার হচ্ছে প্রতিদিন।

কাপাসারা গ্রুপে দীর্ঘ দিন ধরে বারো টনের পারমিট জাল- ডেলিভারি অরডার আর নকল চালানের কল্যাণে বারোশ টন হয়ে কোলিয়ারির ভার লাঘব করেছে নবদ্বীপের জনৈক হোলসেলার। আর সালানপুর, বনজেমারি, দেন্দুয়া থেকে কয়লা বোঝাই সাইকেলের দীর্ঘ মিছিল চোখে পড়বে প্রতিদিন। কালোপ্লেটে হলদে রঙের লেখা ই সি এলের সাহেবদের গাড়ি এদের পাশ দিয়ে হুস হাস করে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে যায়। চাঁদির জুতোর ঘায়ে ওদের চোখের ছানি ভীষণ ঘন। তাই—

এক একটা সাইকেলে গড়ে ৮/১০ মন কয়লা বয়ে নিয়ে যায় সুকুমার, পরিমল শেখ আলিরা। খরচা সব মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। বিক্রি হয় বারো-চোদ্দ টাকা মন।

কেবল বোররা কোলিয়ারি থেকে সাইকেলে দৈনিক পাচার হয়ে যে পরিমাণ কয়লা তার দাম টাকার অংকে ৮৪,০০০। আর এই বিশাল কয়লা ক্ষেত্র থেকে? বুঝ মন যে জান সন্ধান। এছাড়াও আছে—

সম্প্রতি ভিজিলেনস ডাইরেকটর ও সি বি আইয়ের যৌথ হানায় ওয়াগনে কয়লা পাচারের একটি চক্র ধরা পড়েছে কাসুনা, পাথরডি অঞ্চলে। এক একটি বকস ওয়াগন পিছু ওভার লোডিং গড়ে ৭.৫ টন!

আর এই সব কালো পথে আসা কয়লার লরি রাতের অন্ধকারে এসে সার বেঁধে দাঁড়ায় রাণীগঞ্জ পানজাবি মোড়ে। লরি পিছু দুশ' থেকে তিনশ' টাকা ঢাললেই মিলে যাবে নিখুঁত ছাড়পত্র! আসলের সঙ্গে নকলের ফারাক ধরা দুঃসাধ্য। এই সাদা কালোর খেলা রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আসানসোল, রাণীগঞ্জ. অঞ্চলের শান্তি-রক্ষকদের। রাত চরা টহলদার গাড়ির আনাগোনাতেই তা মালুম হয়। তবে এই টহলদারি নেহাতই কিছু প্রাপ্তিযোগের আশায়, শিকারের সন্ধানে!

শিকার সন্ধানী ছাড়া এদের আর কীই বা বলা যায়? কোলিয়ারি অফিসার আর কিছু চিহ্নিত সমাজ বিরোধীদের যোগসাজসে রাণীগঞ্জের এক নামী হোটেল মালিকের সাদা কালোর রমরমা ব্যবসার খবর সাধারণ মানুষ জানলেও যাদের জানার কথা তারাই জানেন না এ কেমন করে হয়! এমনটি হয় এবং হচ্ছে প্রতি রাতে। নিয়মিত। লরির পর লরি চোরাই কয়লা বোঝাই হয়ে আন্তঃ রাজ্য ছাড়পত্র নিয়ে চণ্ডিগড়, বেনারস, লখনউ কিংবা হিসারে পাড়ি জমাচ্ছে অনায়াসে!

এই সব চোরা পথে পাচার কয়লার হিসাব মেলাতে যে সনাতন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয় তা হল: বারনিং প্রবলেম। ই সি এলে '৭৯-র জানুয়ারি—জুনে ১৫০,০০০ টন কয়লা খনিমুখেই জ্বলে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন সি এম ডি—সি এস ঝা। তার মতে ওয়াগন সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্যেই এমন কাণ্ড ঘটেছে।

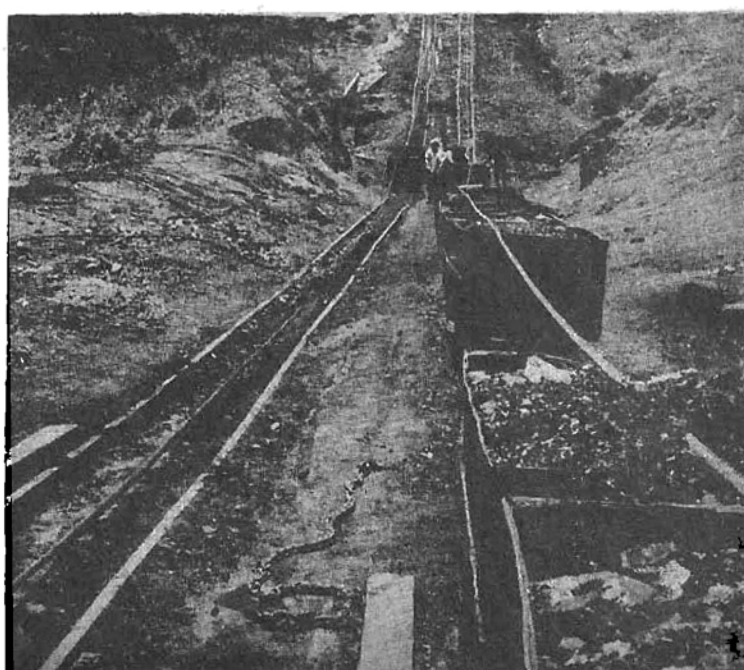
সাধারণত পিট হেডে ১০.০০০ টনের বেশি কয়লা জমলে কয়লাজাত স্বাভাবিক গ্যাস উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে! কিন্তু ময়রা কোলিয়ারির এক প্রবীণ কর্মী বললেন, 'ওসব মশাই হিসেব মেলাবার খেলা! কয়লা তো দপ করে জ্বলে উঠেই ছাই হয় না,দীর্ঘ দিন ধরে জ্বলে। সেই জ্বলা কয়লা নেভাতে দমকল আসে না কেন? এই ধরুন বিশ্বেশ্বরী খান্দরা কোলিয়ারির কথা। দমকলের চোখের সামনে কয়লায় আগুন লাগানো হল। কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তবু ওরা নেভাতে এলো না কেন? না, লরিতে কয়লা বিক্রির পারমিট বন্ধ করায় বাবুদের চুরির অসুবিধে হচ্ছিল।'

হিসেব মেলাবার তাগিদেই ভানোরা এলাকার দরওয়ান নির্বিকার চিত্তে আগুন লাগায় পিট হেডে। ঘনশ্যামে বিশেষ বিশেষ পিটের কয়লার ডি ও কাটা হয় না। তিরিশ-তেত্রিশ ফুটের মূল্যবান কয়লার পাহাড় জ্বলে যায় কোল ফায়ারে। লাখ লাখ টাকার কয়লা ছাই হয় নিউ কাজোরা, কুমার ডিহি, সাতগ্রামে শুধু বুক স্টক, ফিজিক্যাল স্টক আর আনালিমিটিড' করাপশনের স্টক মেলাতে গিয়ে। এটাই রেওয়াজ এটাই রীতি হয়ে গিয়েছে। এই প্রতারণা, এই লুট—

'ই সি এলের চিটিং আর লুটিংয়ের কারবারের মধ্যমণি এই পারচেজ আর সেলস ডিপারটমেনট', ডিশেরগড়ের সেলস অফিসের ক্যানটিনে বসে খেদ প্রকাশ করেছিলেন ব্যানারজিবাবু। 'বিভিন্ন এলাকার এরিয়া ম্যানেজার, জি এম-রা সংকতোরিয়ায় নৈবেদ্য পাঠিয়ে ঢালাও লুটের কারবার চালু রেখেছে—সাব স্ট্যানডারড কোয়ালিটির স্পেয়ার পারটস থেকে মেশিনারি, শালবল্লা থেকে স্টোয়িংয়ের বালি—কোথায় পৌঁছয়নি এদের লোভের হাত! সবচেয়ে আশ্চর্য এখানকার 'রেট কনট্রাকট সিসটেম'। কাঁচামালের ওঠানামার বাজারে ই সি এল আগাম নির্ধারিত দামে চুক্তি করে জিনিস কেনেন। নীট ফল হিসেবে প্রায়ই দেখা যায় ৩০ টাকার জিনিস রেট কনট্রাকটের দৌলতে ১৩০ টাকায় কেনা হচ্ছে। স্পেসিফিকেশন কিংবা কোয়ালিটির বালাই নেই—শুধু কনট্রাকট সই করার সময় 'সাদা খামে' প্রণামী থাকলেই 'সব ঠিক হ্যায়' ছাপ পেতে দেরি হয় না। মাল না ফেলেই টাকা নেওয়ার ঘটনাও বিরল নয়!

ব্যানারজিবাবুর মুখের কথা শেষ না হতেই পংকজবাবু বললেন, বিরল মানে মগমার সেই জি এমের কীর্তি মনে নেই? ভুয়ো ঠিকানার ভুয়ো কোমপানিকে ফেক পারচেজের এগেনসটে দেড় লাখ টাকা পেমেনট দেওয়া। করিত কর্মা জি এম সাহেব ব্যাংকের এজেনটে-র সাহায্য নিয়ে পুরো টাকাটাই ক্যাশ করে নিয়েছিল! এই কেস নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। সি বি আই লেগেছিল। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোতেই সব ধামাচাপা! এখানে পারচেজের পুরো ব্যাপারটাই ইরেগুলারিটিজে ভরা। না মেনটেইন হয় ডকুমেনট, না রাখা হয় কোন রেকরডস। অ্যাডমিনিসট্রেশনের হাজার ছেঁদা দিয়ে প্রতিদিন এক কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। ম্যানেজমেনট কয়লার দাম বাড়িয়েও তা সামাল দিতে পারছেন না। ব্যুরো অব পাবলিক এনটারপ্রাইজের স্ট্যানডিং সারকুলার (ঃ জি এল / ০১৬ / ৭৭ বি পি ই-এম এম) কে কলা দেখিয়ে ভুঁইফোঁড় কোমপানিগুলি অবাধে লাঠি ঘোরাচ্ছে।'

পংকজবাবুর কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন সি পি এম এম এল এ হারাধন রায়। তার অভিযোগ,ই সি এলে যে ১৪ কোটি টাকার স্মলস্কেল পারচেজ হয় তার দু'শতাংশ জোটে লোকাল ইউনিটগুলির ভাগ্যে। 'শুধুমাত্র কোলটাব তৈরির বরাত থেকে স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে বঞ্চিত করে প্রায় তিনকোটি টাকা বাড়তি লোকসান করছে ইসটারন কোল-ফিলড কর্তৃপক্ষ'—এ অভিযোগ টাইনি স্মল ইনডাসট্রিস ওনারস এসোসিয়েশনের সম্পাদক কল্যাণ মজুমদারের। অভিযোগ অভিযোগ আর অভিযোগের উদ্যত তর্জনীর মুখেও নির্বিকার নৈরাজ্যের রাজত্ব চলছে। কয়লাক্ষেত্রের একেবারে নীচুতলা থেকে সুউচ্চ শিখর পর্যন্ত


খনি থেকে কয়লা তুলে ওপরে পাঠানো হচ্ছে/ অশোক বসু



কয়লা খনির নারী শ্রমিক/আলোক বসু

একই দুনীতির কালো শেকলে গাঁথা। এরা সকলেই জেনে গেছেন অভিযোগ তা যতই সুনির্দিষ্ট হোক না কেন বিচারের বাণীর নীরবে কান্না ছাড়া নান্য পন্থাঃ!

এমনি একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছেন উৎপল মুখোপাধ্যায়, শ্রীপুর এরিয়ার গিরেমিনট সাব-এরিয়ার বাঁক শিমুলিয়া কোলিয়ারির কথাই ধরা যাক। বছর তিনেক হল 'ওয়ারকিং ফেস' নেই বলে কোলিয়ারি বন্ধ। শ্রমিকদেরও ট্রানসফার হয়ে গিয়েছে। স্টোরসের মাল, ভারি যন্ত্রপাতি, অ্যাসবেসটস শীট মোটর, পাম্প এগুলি কিন্তু সরানো হল না। সব এরিয়া ম্যানেজার মিঃ গৌতম আর ম্যানেজার শরমার চোখের সামনে পাচার হয়ে গেল। হয়ত এগুলোই আবার হাত ফেরতা হয়ে পারচেজের কল্যাণে নতুন করে কেনা হবে!

আসানসোল থেকে চোদ্দমাইল পথ দু'ঘণ্টায় পেরিয়ে যখন সাঁকতোরিয়ার সদর দফতরে পৌঁছলাম তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরিয়ে কয়েক মিনিট এগিয়েছে কি এগোয়নি। বোমবাই কেতায় তৈরি প্রাসাদ বাড়িতে তখনই টিফিনের নিঃস্তব্ধতা। নিঃস্তব্ধ সাবেক লাল বাড়িও। প্রাচীর বেষ্টিত বিরাট এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে ক্যানটিনের কাছে আসতেই সঙ্গী সাংবাদিক বন্ধুকে দেখে কলকলিয়ে উঠলেন ওর পুরোনো বন্ধু। পরিচয় পর্ব সারা হতেই বললেন, 'ই সি এলে শুধু লোকসানের হিসেবই শুনছেন ; এই একটি জায়গায় শুধু লাভ হয় এই ক্যানটিনে! ব্রেড দিয়ে কাটা মাছের পিস, মাড় মেলানো ডাল আর কয়লা মেশানো ভাত বিক্রি করে ই সি এল এক হাজার টাকা লাভ করেছে!

দুঃখ হয় জানেন, কয়লা ফ্রি, স্টাফ পেমেনট দিতে হয় না, ঘর ভাড়া তাও লাগেনা তবুও খাবার যা দেয় তাকে খাদ্য না বলে অখাদ্য বললেও কম বলা হয়। অথচ ম্যানেজমেনটের স্টাফ ওয়েলফেয়ারের ঢাক বাজানোর কমতি নেই।'

আমি ওঠবার তাড়া দিতেই বললেন, 'তিনটে অবদি নিশ্চিন্তে আড্ডা মারুন। তার আগে বাবুরা কেউ অফিসমুখো হননা। সাঁকতোরিয়া থেকে একদম ইনটিরিয়র কোলিয়ারি অফিস পর্যন্ত একই হাল।'

ক্যানটিন থেকে পি আর ইও অফিসে যখন পা দিলাম তখন আড়াইটে বেজে গিয়েছে। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পরই এলেন পি আর ও কে সি মাথান। তিনিই অ্যাকটিং পি আর ও। নাতিদীর্ঘ অবয়ব। চোখের চশমা নামিয়ে রুমালে মুখ মুছে দেরি হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। ই সি এলের হালচাল খবরাখবর জানতে চাইলে একরাশ প্রেস হ্যানড আউট, পূর্বাঞ্চল বার্তা (ই সি এল মুখপত্র) আর সংখ্যাতত্ত্ব হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ন্যাশনালাইজেশনের পরে এই বিশাল কোলফিলডে সাধারণ শ্রমিকের জীবনের মান উন্নত হয়েছে। সেই ফিউডাল শোষণও আর নেই।' ক্রমবর্ধমান লোকসানের প্রসঙ্গে তার মন্তব্য 'র মেটেরিয়াল কসট বেড়ে গিয়েছে সেই সঙ্গে বেড়েছে কর্মীদের মাইনে, হাসপাতাল হয়েছে, নানা খাতে বেড়েছে ব্যয়ের পরিমাণ তাই প্রোডাকশন কসটও বেড়েছে কিন্তু সে তুলনায় সেলিং প্রাইস বাড়েনি। প্রতি টনে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ টাকা লস মারজিন থাকছে। এছাড়া অনিয়মিত ওয়াগন সাপলাই, লোডশেডিংয়ের আক্রমণে আমরা বিপর্যস্ত।'

কয়লার উৎপাদন এবং বণ্টন সম্পর্কে সব কারচুপির ঘটনাই বেমালুম চেপে গেলেন। বললেন, আগে বেসরকারী মালিকানায় মোসট আনসায়েনটিফিক মাইনিংয়ের ফলে কোল সীম ব্লক হয়ে যেত এখন সর্বত্রই মডারন টেকনিক এবং সফিসটিকেটেড মেশিনারিজ ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বেড়েছে। প্রোডাকশন ইনসেনটিভ হিসেবে 'উদ্যোগ ও সফলতা' পুরষ্কার চালু করে বেশ ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ ন্যাশনালাইজেশনের প্রথম বছর প্রোডাকশন ছিল ২১·০৬ মি. টন, চলতি বছর তা ২৬·০৬ মি. টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওপেন কাসট প্রোজেকট (ও সি পি) চলতি ৮টির থেকে বাড়িয়ে ১২টি করা, স্ক্র্যাপার মাইনিং, লং ওয়াল মাইনিংয়ের পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। নতুন ২৭টি ইনক্লাইনেশন ছাড়াও ২২টি মিান ও ৮টি বড় কোল হ্যানডলিং প্ল্যানটও চালু হচ্ছে।'

উৎপাদন বাড়ছে না কিংবা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে একথা অস্বীকার করে বললেন, 'শুধু কি উৎপাদনই বেড়েছে? কোল মাইনারদের স্ট্যানডারড অব লিভিংও বেড়েছে।'

'স্ট্যানডারড অব লিভিং তো জবুর বাড় চুকা। ইউ সি দেয়ার ওয়াজ ওনলি টু অর থ্রি ফ্রুট শপস অ্যাট আসানসোল বাট নাউ ঃ অ্যাটলিসট ফরটি টু ফিফটি। ইট ক্লিয়ারলি ইনডিকেটস...' কে সি মাথানেরই কথার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে যুক্তি দিলেন ই সি এলের অন্যতম ডাইরেকটর এস সি গুপ্তা। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বিদ্যুতের অভাবে বিকল থাকায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম! ইনটিমেট সুবাসিত রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে একটা জরুরী টেলেকস বার্তায় চোখ বুলিয়েই বেল টিপে আর্দালীকে ডাকলেন। উঠে আসতে আসতে লক্ষ করলাম কলকাতার একটি নামী দৈনিক বিজ্ঞাপনের লাখ চারেক টাকা বাকি পড়ায় মামলার হুমকি দিয়েছে!

রাস্তায় পা দিয়ে ভাবছিলাম মিঃ গুপ্তার মন্তব্যঃ দেয়ার ওয়াজ... জানিনা ফলের দোকানের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির কোন নিবিড় সম্পর্ক আছে কিনা। কিংবা কর্মীরা সব আঙুর আপেল খাচ্ছেন কিনা। তবে বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চোলাই মদের ঢালাও কারবার বেড়েছে, কোলিয়ারিতে দেহপসারিণীরা কারবার জমজমাট করেছে, সেই সঙ্গে কাবুলীওলাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্যাশিয়ারবাবুদের চড়া সুদের রমরমা কারবার বিলক্ষণ চোখে পড়েছে। আগে সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণ ছিল শ্রমিকদের উপর মুষ্টিমেয় কোল প্রিনস কিংবা কোল কিংদের। এখন সেই মহাজনী শোষণ নেমে এসেছে নিচুতলাতেও —মাছের তেলে মাছ ভাজছেন যে যার মওকা মত।

ওয়েলফেয়ারের ঢাকের বাদ্যি দিয়ে শ্রমিকদের ধাওড়ার করুণ অবস্থাকে চাপা দেওয়া যায়নি। খোদ শীতলপুরেই দেখেছি জনকল্যাণ কর্মের নিদর্শন—জেলখানার কনডেমনড সেলের মত অপ্রশস্ত কুঠুরির সারি। ডিশেরগরের 'বি' টাইপ অফিসারস কোয়াটারসের নিচেও মেঘ ডাকে। বছর না ঘুরতেই ফাট ধরেছে দেওয়ালে। মাইনস সেফটির অনুমতি ছাড়াই তৈরি হয়েছে এই কোয়াটারস। বিরাট হাসপাতাল হয়েছে কাল্লায়। কিন্তু—

'ওখানে ওষুধ মিইলছে না কুন দিন। কমপানডার বাবুদের পয়সা

না দিলে ওষুধ মিইলবে নাই'। ধেমো মেইন কোলিয়ারি থেকে তাই হরিশ মুর্মু চলেছে সদর সাঁকতোরিয়ায় ! দরজা-ভাঙ্গা স্প্রিং-বিহীন অ্যামবুলেনস চেপে লাফাতে লাফাতে। আর সেই অ্যামবুলেনসের হালও বড় করুণ—ভিতরে বসার জায়গা জুড়ে ছড়ানো ওয়ারকশপের মালের গাদা, ছোট্ট দরজা ভাঙা বিবর্ণ আলমারিতে একদলা জুট -ওরই মধ্যে নারকীয় পরিবেশে আসন্নপ্রসবাসহ জন পনেরো রোগগ্রস্ত মানুষ ! খোদ সদরের চারটি অ্যামবুলেনসেরই এই জরাজীর্ণ দশা—এরিয়ার কথা নাইবা মনে আনলাম।

'সেফটি উইক 'সেফটি ড্রাইভ' নামের গালভরা শব্দ আছে। কিন্তু নিরাপত্তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। আনডার সাইজ শালবল্লা দিয়ে রুফ ফলিং আটকানো যাচ্ছে না। যেখানে সলিড ব্লাস্টিং টোটালি প্রহিবিটেড সেখানেও তা হচ্ছে। যেমন হয়েছে এই সেদিন ভানোরা আর তারপর বাঁকোলাতে। কতকগুলি নিরীহ প্রাণ শেষ হয়ে গেল। ব্লকেড তৈরি হল একটা নতুন সীমের মুখে স্রেফ খামখেয়ালির খেসারত দিতে··· ডি জি এম এসের মিঃ মিত্র দুঃখ করে বলছিলেন, আরও কয়েকটা চাসনালা না হলে এদের মর্জি মাফিক চলা বন্ধ হবে না। আমাদের সীমিত লোকবল দিয়ে এতো বড় নৈরাজ্য ট্যাকল করা সম্ভব হচ্ছে না। এদের না আছে প্ল্যানিং না আছে কিছু—

অথচ কয়লা শিল্পে আধুনিক উত্তোলন ব্যবস্থা ও নকসার জন্যে যে চারটি আঞ্চলিক কোলমাইনস প্ল্যানিং অ্যানড ডিজাইন ইনসটিটিউট আছে ভারতের বিভিন্ন কয়লাক্ষেত্রে তারই একটি আসানসোলে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলাম ভারতের বৃহত্তম কয়লাক্ষেত্র ইসিএলে তাদের সক্রিয় সহায়তায় আধুনিকতম খনি ব্যবস্থার বিকাশ ঘটবে। উৎপাদনে আসবে প্রার্থিত জোয়ার। কিন্তু হতাশ করলেন সি এম পি ডি আইয়ের অন্যতম সি এম ই এ এন ব্যানারজি। তার কথায়, 'আমাদের ভূমিকা অনেকটাই কনসালটেটিভ এজেন্সির মত। যেমন করেন দস্তুর কোমপানি। রিকুইজেশন অনুযায়ী আমরা প্ল্যানিং করি, ডিজাইন করি কিন্তু তার কতটুকু ইমপ্লিমেনট হবে, কতটুকু হবে না তার পুরোটাই ই সি এলের উপর নির্ভরশীল।'

শুধুমাত্র পরামর্শদান সংস্থার শিখণ্ডী ভূমিকা পালনের জন্যে বিশাল এলাকাজোড়া আধুনিকতম অফিস বিলডিং আর চিফ, অ্যাডিশনাল আর মাইনিং ইনজিনিয়রদের নিয়ে শতাধিক কর্মীর এই প্রতিষ্ঠানের খরচ চালানো শ্বেতহস্তী পোষার মতই বিলাসিতা। যাদের পরিশ্রম, কর্মপ্রচেষ্টার রূপায়ণ মুষ্টিমেয় কর্তাব্যক্তির খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল সেখানে এই বিপুল অংকের অর্থ অপচয়ের যুক্তি কোথায় ?

যুক্তিবিহীন এই অপচয়ের অকটোপাস ভারতের কয়লাক্ষেত্রগুলিকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অন্তঃসারশূন্য করে চলেছে। লোকসানের অ্যানিমিয়া এখন আর ভরতুকির ব্লাডট্রানসফিউশনে চাপা থাকছে না। অথচ যাদের হাতে এর সুখ অসুখের দায়দায়িত্ব নির্বিকার শুধু তারাই।

শুধু যে নির্বিকার তাই নয়। বাদশাহী বিলাসে আসক্ত। শীতলপুরের রেসট-হাউসে মন ওঠেনা এইসব সরকারী মিনি বাদশাদের—কলকাতার পাঁচতারা হোটেল থেকে নিউমারকেট এলাকার নামী হোটেলে বিশেষ-কামরা বুক করা থাকে সারা বছর ! প্রতিদিন এই বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত লোকসানি-সংস্থার ১৯১টি গাড়িতে তেল পোড়ে লাখ টাকার। মেয়ের চুলের ফিতে, ডাইংক্লিনিং কিংবা মারকেটিং থেকে বাঁকুড়া, গিরিডিতে উইক এনড ট্যুর সব গলে যায় 'ফর ইনসপেকশন পারপাস'-এর ছিদ্র দিয়ে।

এতো বড় সংস্থার পুরো ট্রানসপোরটেশন ব্যবস্থাটাই ঠিকাদারের হাতে। সাধারণ বাস দিয়ে ডিলুকসের ভাড়া নেওয়া হচ্ছে হামেশাই। মাত্র দশ-বারোটি সুসজ্জিত ছেলেমেয়েকে আসানসোলের নামী কনভেনটে পৌঁছে দিতে ৫৬ সীটের বিশাল আকারের অশোক লেল্যানডের বিলাসীবাসের ভাড়া গোনারও কমতি নেই। যে কোন দিন আসান-সোলের সেনট পিটারস কিংবা ভিকটোরিয়া কনভেনটের সামনে ঝিমোতে

কয়লার (সফট কোক) কোলিয়ারী দর কখন কত বেড়েছে

কবে	কোন শ্রেণী	টন-পিছু দর
১৯৭৩ রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার আগে	'এ' গ্রেড	৪৫ টাকা
	'বি' গ্রেড	৩৬ টাকা
১৯৭৩ রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর (জানুয়ারি)	'এ' গ্রেড	৫৫ টাকা
	'বি' গ্রেড	৪৮ টাকা
১৯৭৩ ডিসেমবর	'এ' + 'বি' একীকরণ	৬০ টাকা
১৯৭৪ এপরিল	*	৭২ টাকা
জুন	*	৮৬ টাকা
১৯৭৫	*	৮৬ টাকা
১৯৭৬	*	৮৬ টাকা
১৯৭৭	*	৮৬ টাকা
১৯৭৮	*	৮৬ টাকা
১৯৭৯ (জুলাই ১৭)	*	১০৯ টাকা
১৯৭৮	ন্যাচারাল সফট কোক	৫০.৯০ টাকা
১৯৭৯		৯৫.৪০ টাকা

দেখা যায় বিভিন্ন এরিয়ার নেভিব্লুরঙ 'ইসটারন কোলফিলডস লিমিটেড' এরিয়া নং—মারকা বাসগুলিকে। এই বিলাসিতার কি সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল ?

এই প্রশ্নের জবাব যেমন মিলবে না তেমনি মিলবে না প্রশাসনিক নৈরাজ্যের সীমা। একটি বিশেষ গোষ্ঠিচক্রের নেকনজরে থাকবার মত গুণাবলি না থাকলে বদলি থেকে বরখাস্ত যে কোন দণ্ড নেমে আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে। সেই সঙ্গে সীমাহীন স্বজনপোষণের ছিদ্রপথে অবাঙালী আধিপত্য কায়েম পর্বও চলছে জোর কদমে। এখানে কেউ 'প্রমোশন' কেনে টাকার খেলায় কেউবা বেওসার সুযোগ বজায় রাখতে 'ডিমোশন' কিনে নেয় কাঞ্চন মূল্যে। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের কাজে এতটুকু সমন্বয় নেই। যা আছে তা শুধু বলগাহীন ক্ষমতার যথেচ্ছাচার।

ওপেন টেনডার, ফ্রি সেল, নোটশীট কোথায় নেই এদের কারচুপির হাত ? সোদপুর, পুনিয়াটির ওয়ারকশপ কর্মবিহীন নৈঃশব্দ্যে ডুবে থাকে কাজের অভাবে। মেরামতি কাজ চলে যায় তৃতীয় পক্ষের হাতে, স্যানডস্টোয়িংয়ের স্থান নির্বাচন হয়ে যায় পারদর্শন ছাড়াই, ৭০ লক্ষ টাকায় কেনা অকেজো টায়ারের পাহাড় জমে সেনট্রাল ওয়ারকশপে আর উৎপাদনের কাজে দক্ষ মাইনিং ইনজিনিয়ারদের ঠাঁই নিতে হয় ভোকেশনাল ট্রেনিং সেনটারের কর্মবিহীন অন্ধকারে।

আর এই অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে কয়লা-নির্ভর ভারতীয় অর্থনীতি, চাকা ঘুরছে না রেলের, কয়লার অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের প্রাণ প্রবাহ। আমাদের তাবৎ শিল্পের শরীর জুড়েই তো তাপ বিদ্যুতের উষ্ণতা—যার একমেবাদ্বিতীয়ম উৎস কয়লা।

কয়লা শিল্পের এই নৈরাজ্য, এই অপচয় আর লোকসানের জ্যামিতিক প্রগতিতে বেড়ে চলার যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড়। শক্তি সংকটের চরম আঘাতে বিপর্যস্ত টালমাটাল ভারতীয় অর্থনীতির বেহাল অবস্থা দেখে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানও চিন্তিত। অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্যে তার শেষ নিদান : কয়লা শিল্পে অতি নিরানন্দজনক অথচ প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী।

রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা শিল্প সম্বন্ধে এটাই বোধহয় এই মুহূর্তের শেষ কথা। কিন্তু ঘণ্টা বাঁধবে কে ? ★

(কৃতজ্ঞতা : তথ্য ও জনসংযোগ, দফতর, ই সি এল)

বিশ্ব-বিচিত্রা

কেটেছে একেলা

সোভিয়েট তরুণীরা ওদেশের 'মড' বাউণ্ডুলেদের বিয়ে করতে চাইছে না। এজন্যে তারা আজীবন কুমারী থাকতেও রাজি। ২৫ থেকে ২৮-এর মধ্যে ওরা পারিবারিক নিরাপত্তাটুকুও হারায়। অথচ নির্ভরযোগ্য পাত্রও জোটাতে পারে না। সম্প্রতি এই মর্মে তিন বিদূষী তরুণী এক সোভিয়েট সংবাদপত্রে একটি আকুল আবেদন রেখেছে। ১৯১৭র বিপ্লবের পর ওদেশে আর ঘটকালি বিয়ের রেওয়াজ নেই। অথচ, পশ্চিমীদের মত একা থাকার ও অন্য সুবিধা ভোগের সুযোগও অমিল। এজন্যে লেনিনগ্রাড, কিয়েভ ও মিনসক সহরের নৈশ-ক্লাবগুলো এঁদের নিঃসঙ্গতা দূর করছে। এক কাপ চায়ের উষ্ণতায় তরুণ-তরুণীদের জন্যে পাতা রয়েছে সান্ধ্য আসঙ্গের ফাঁদ। কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে?



খোরপোষ আইন

বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমায় খোর পোষ দেবার বাধ্য-বাধকতা শুধু বিবাহ বিচ্ছিন্ন স্বামীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছিন্না স্ত্রীর ক্ষেত্রে ছিল না। এক-পেশে এই আইনটিকে যুক্তরাজ্যের সুপ্রীম কোরট অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছেন। সংখ্যাগুরু পুরুষ-প্রধান আদালত ১১টি রাজ্যে খোরপোষের এই আইনটিকে খারিজ করে দিয়েছেন। বিচারপতি উইলিয়াম ব্রেনান সংখ্যাধিক্যের মতামত জানিয়ে বলেছেন: সমানাধিকারের যুগে মহিলাদের আর শুধু ঘর-সংসার ও সন্তান পালনকারী এবং পুরুষদের শুধু উপার্জনকারী বলে মনে করা ঠিক হবে না। আদালত রায় দিয়েছেন: আলাবামার খোরপোষ-আইন যুক্তরাজ্যের চতুর্দশ সংবিধান সংশোধনের সমানাধিকার-সংক্রান্ত ধারাটিকে খারিজ ক'রে দিয়েছে।

মুশকিল আসান

চীনা দাঁতের ডাক্তারদের সুনাম আকাশ-ছোঁয়া। চৈনিক দন্ত চিকিৎসালয়ে গিয়ে টুক করে দাঁতটি উপড়ে ফেললেই যন্ত্রণা উপশম। তোফা আরাম।

চীনা দাঁতের ডাক্তাররা এবার আরো এগিয়েছেন—খবর নিউ চায়না নিউজ এজেন্সির। দাঁত শুধু উপড়ে নেওয়াই নয়, উপড়ে দাঁতটিকে রোগমুক্ত করে ফের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিক ঠিক ভাবে। শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে এধরনের পুনর্দন্ত স্থাপন।

সাপের ঝোল



সাপের ঝোল বেজায় বলবর্ধক। অন্ততঃ টনিক-প্রিয় সিয়োলীদের কাছে। এর নাম 'বাইম তাং'। বিভিন্ন রেস্তোরাঁতে সাপের ঝোল রাঁধতে রোজ প্রায় তিরিশ হাজার সাপ লাগে। এ খবর কোরিয়ার এক সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত গবেষণা সংস্থার। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার এই রাজধানী শহরে প্রায় ৮০ লক্ষ লোকের বাস। এখানে প্রায় ৬০০ সাপের ঝোল বিক্রি করার মত রেস্তোরাঁ আছে। এদের মালিকরা এক পাত্র সাপের ঝোলের দাম নেয় ১৮০ টাকা থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে। এদের দাবি: রোজ এক পাত্র করে সাপের ঝোল ১০ দিন খেলে শরীরে নাকি বলবৃদ্ধি ঘটবেই।

রাজ্যে রাজ্যে

গরুটির আসল রং

কালো গরু হয়ে গেল বিলকুল হলদে। আর যার তার কাছে নয়, খোদ ম্যাজিসট্রেট এরকম রায় দিয়েছেন। ফলে গরুটি হলদে না হয়ে যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় যে ডিপ্‌টির দাপট দেখা যেত অনেকটা সেরকমই।

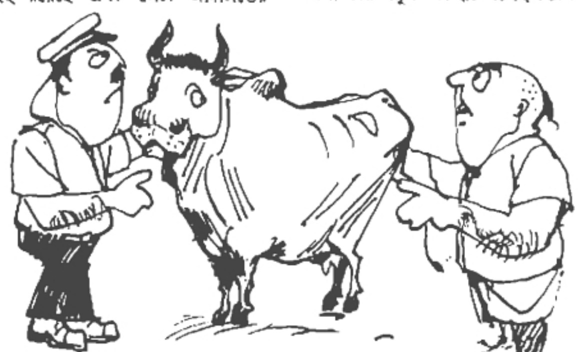
তামিলনাড়ুর এক পুলিশ ইনসপেকটরের একটি গরু মাঠে চরতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। গরুর মালিক পুলিশে ডায়েরি করেন এবং ডায়েরিতে সেটা কালচে বলেই উল্লেখ করেন।

এদিকে আবার আঞ্জনামাই থানায় স্থানীয় ভি আই নীলামে একটি গরু বিক্রি করে। এই গরুটিও বেওয়ারিশ পাওয়া গিয়েছিল। এটা ১৯৭৭ সালের সেপটেম্বর মাসের ঘটনা। গরু যে কিনেছিল, পরের বছর মারচ মাসে তার কাছ থেকে এগমোর থানার পুলিশ ইনসপেকটর একজন হেড কনসটেবল নিয়ে গিয়ে জোরজার করে ফেরৎ নিয়ে আসে। গরুটি তখন থেকে পুলিশ ইনসপেকটরের কাছেই থেকে যায়। মাদরাজ জেলার প্রথম অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটান' ম্যাজিসট্রেট সেরকমই আদেশ দিয়েছিলেন।

নীলামে যে গরু কিনেছিল সে এবার নিরুপায় হয়ে হাইকোরটের শরণাপন্ন হয়। বিচারপতি এম এর সককর সাঈদের ঘরে মামলা চলে। বিচারপতি সাঈদ রায় দেন, গরুটি যে আবেদনকারীরই, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিচারপতির রায়, আবেদনকারী গরুটি নীলামে কিনেছিল। সেই নীলামের রসিদ তার কাছেই রয়েছে এবং সেটা আদালতের কাছে দাখিলও করেছে। রসিদে গরুর রঙ লেখা রয়েছে গাঢ় হলুদ।

এগমোর থানার পুলিশ ইনসপেকটর তখন যুক্তি দেখান, এই গরুটা তারই। গরু হারাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশে ডায়েরি করেন। অবশ্য তার গরুটি কালচে বলেই তিনি উল্লেখ করেছেন।



ম্যাজিসট্রেট কোন গরুটা কার, নীলামে কোন গরু তোলা হয়েছিল—এসব খবর না নিয়েই নীলামের গরুটা ফেরৎ আনার আদেশ দিয়ে দিলেন। ইনসপেকটরও সুবোধ বালকের মতো নীলামে কেনা গরুটা জোর করে আদায় করলেন।

আদালত রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে ম্যাজিসট্রেটকে মৃদু ভৎর্সনা করেন এবং সেটি আবেদনকারীকে ফেরৎ দেবার আদেশ দেন।

আসলে, নীলামে যে গরুটা তোলা হয়েছিল ম্যাজিসট্রেট তার রঙ দেখেননি, ইনসপেকটরের যে গরুটা হারিয়েছিল তার রঙও দেখেননি। শুধু কাগজপত্রে ঐ দুটো হয়ে গেল একই গরু। আর দোসরা গরুর হিসেব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। একে অবশ্য উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে বলা উচিত নয়, বলা উচিত বড় দারোগার দাপট।

জেলায় জেলায়



ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ কাগজ ও খাতা চোরাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। তাম্রলিপি ও বঙ্গলিপির বাঁধন খুলে দিস্তা হিসাবে প্রকাশ্যে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর, সিউড়ি, বোলপুর, সাঁইথিয়া প্রভৃতি বাজারে। কাগজের হোলসেল ডিলারও এই কাজ করছেন। ছাত্রছাত্রীদের কালোবাজার থেকেই কাগজ খাতা কিনতে হচ্ছে। জেলা প্রশাসনকে জানিয়েও কোন ফল নেই।

([illegible])

খেজুরী থানার অন্তর্গত 'বিরবন্দর পাইল' ব্রিজটি আবার কাঠের খুঁটি দ্বারা মেরামত হলো। অথচ কাঠের খুঁটি প্রতি বছরই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য কাঠের বদলে কংক্রীটের খুঁটি লাগানো দরকার। কাঠের খুঁটিগুলি কাঁকর নামক এক প্রকার জলপোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় ও ক্ষয়ে যায়। সরকারী ঔদাসীন্যে শুধু শুধু অর্থের অপচয়।

(সরেজমিন/পাঁশকুড়া)

অণ্ডাল-গোরাংডি লাইনে যে ট্রেনটি চলে, তাতে ড্রাইভার এবং গার্ড সাহেবের ব্যবসা বেশ ভালো রকম চলছে। এরা প্রত্যেক দিন নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে ইনজিন থেকে কয়লা বিক্রি করেন এবং প্রতিদিন রেলওয়ে দপ্তরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিনা টিকিটের যাত্রীদের নিয়ে যান কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে। অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেলপথেও এই একই অবস্থা।

([illegible]/বর্ধমান)

ধুলিয়ানের ইউকো ব্যাংকে জনৈক খুদাবক্স জালিয়াতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। আগের দিন সে পাঁচ টাকা দিয়ে নতুন এ্যাকাউনট খোলে। পরের দিন সাত হাজার টাকা তুলতে যায়। তার পাশ বইয়ে দেখা যায় যে কুড়ি হাজার টাকা জমা করা আছে এবং সই করা আছে। চেক সই করে সে ব্যাংক কর্মচারীর হাতে দেয়। কর্মচারী এ্যাকাউনট বুক খুলে দেখে আগের দিন মাত্র ৫ টাকা দিয়ে এ্যাকাউনট খুলেছে। সন্দেহ হয় পাশবুক দেখে। সই জাল। পুলিশের হাতে আসামীকে দেওয়া হয়েছে।

(জনমত/মুর্শিদাবাদ)

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজীভাইর দীঘা আগমন উপলক্ষে স্বচ্ছন্দ গতিবিধির জন্যে দীঘার তিনটি বাম্প তুলে দেওয়া হয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রী চলে গেলেন, কিন্তু বাম্প ফিরিয়ে দেওয়া হলো না। তার চরম মূল্য দিতে হল ১ নভেম্বর রাত দশটায় WGB 2950 নরঘাট কিয়াগেড়িয়া বাসের তলায় তিনটি অমূল্য প্রাণ দিয়ে।

(খেজুরী/মেদিনীপুর)

সবং থানার রামভদ্রপুর গ্রামের নির্মল পট্টনায়েকের এক গৃহপালিত ছাগী গত ৩০ অকটোবর একটি অদ্ভুত ছাগ প্রসব করে। ছাগটির একটি মাথা, দুটি চোখ, চারটি কান, আটটি পা!

(মেদিনীপুর সংবাদ)

রেল স্টেশনে সাধারণের জন্য রক্ষিত টেলিফোনটি দীর্ঘ কয়েকমাস যাবৎ নির্বাক। রেলযাত্রী, সাধারণ মানুষ পয়সার বিনিময়েও সংক্ষিপ্ত সময়ে যোগাযোগের সামান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত। রেল কর্তৃপক্ষ কিংবা তার বিভাগ কি এই মূক-বধির যন্ত্রটির চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে পারেন না?

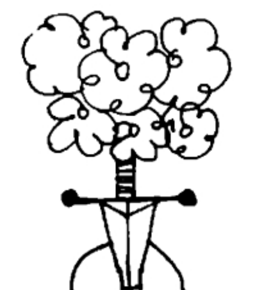
(সাপ্তাহিক দিনভাই/বীরভূম)



ওপার বাংলা

প্রেমের মূল্য

কুমিল্লার চা-দোকানের মালিক মানিক মিয়া। ঘরে তার যুবতী মেয়ে। সালমা। সুন্দরী সালমা একদিন মন দিয়ে ফেলল এক পরিচিত যুবককে। কিন্তু মন দেয়া-নেয়ার এসব ব্যাপার-স্যাপার না-পসন্দ মানিক মিঞার। প্রথমে আপত্তি। তারপর প্রহার।



এ খবর যথারীতি পৌঁছয় প্রেমিক যুবকটির কানে। তারপরই রক্তারক্তি কাণ্ড! সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পথে ছুরির ঘায়ে জখম হলেন মানিক মিঞা। পরে হাসপাতালে মারা যান তিনি। প্রেমিক শাহ্ আলম পলাতক। (দৈনিক বাংলা)

পণপ্রথা প্রতিরোধে

পণপ্রথা, বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সমাজে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এর উচ্ছেদ চাই। এজন্য পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা চাই। অবিলম্বে এই আইন রচনা করতে হবে।—সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি। (দৈনিক ইত্তেফাক)

জাল ওষুধ

দেখতে আসল ক্যাপসুলের মতোই, কিন্তু ক্যাপসুলের ভেতরে? ভেতরে চকের গুঁড়ো। কালমেঘের বোতলে চিরতার জল।

বাংলাদেশের নরসিংদী থেকে এরকম ১৫,০০০ নকল টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল আর ২৫ ডজন বোতল কালমেঘ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

ধরা পড়েছে জাল ওষুধের ব্যবসায়ী সালাহউদ্দিন আর তার দুই শাকরেদ।

(দৈনিক বাংলা)

বিদ্যুৎ বিল বাকি

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রায় ১৬,৬৫,০০,০০০ টাকার বিদ্যুৎবিল গ্রাহকদের কাছে বাকি পড়ে রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে বাকির পরিমাণ প্রায় ১২,১৪,০০,০০০ টাকা। সাধারণ গ্রাহকদের কাছে বাকি প্রায় ৪,৫৩,০০,০০০ টাকা।—এ হিসেব চলতি বছরের মারচ মাসের শেষ সপ্তাহের। এর মধ্যে মহানগরী ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের বাকির পরিমাণ প্রায় ৩,২৩,০০,০০০ টাকা। (দৈনিক বাংলা)

ভারত থেকে

বাংলাদেশ রেলওয়ে বোর্ড ২ কোটি টাকা মূল্যের ২০টি ব্রডগেজ রেলবগি আমদানির একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ভারতের অন্যতম রেলওয়ে কোচ নির্মাণকারী সংস্থা জেসপ অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে সম্প্রতি কলকাতায় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জেসপ কোম্পানি বাংলাদেশকে ২০ ও ৩০ টনের দুটি ক্রেনও সরবরাহ করবে। (দৈনিক বাংলা)

রসাল সংবাদ

এক আমগাছে ৫ মাসে ৪ বার মুকুল এসেছে। ফল ধরেছে। সুন্দরগঞ্জের দক্ষিণ ধোপাডাঙ্গা গ্রামের গোলাম বকশীর আম গাছটিতে প্রথম মুকুল আসে মাঘে। আম পাকে জ্যৈষ্ঠে। দ্বিতীয়বার মুকুল আসে ফালগুনের শেষে, তারপর বৈশাখে—সে আম এখনও কাঁচা। চতুর্থবার মুকুল এসেছিল আষাঢ়ের মাঝামাঝি। (দৈনিক বাংলা)

মরণোত্তর

ওস্তাদ আয়েত আলী খান, ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন খশরু এবং কমল দাশগুপ্ত—এই তিন প্রয়াত শিল্পীকে বাংলাদেশ শিল্পকলা আকাদেমী মরণোত্তর পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন।

একটি অভিজ্ঞানপত্র ও নগদ ৫ হাজার টাকার পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় তিন শিল্পীর নিকট আত্মীয়ের হাতে।

(বাংলাদেশ টাইমস)

খোদ মন্ত্রী বলেছেন

বাংলাদেশের রেলকর্মীদের মধ্যে দুর্নীতি ও কর্তব্যে অবহেলা দূর করার জন্য ব্যবস্থা নিতে চলেছেন রেলমন্ত্রী আব্দুল আলিম।



তিনি বলেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত রেলকর্মীরা যদি নিজেদের সংশোধন না করেন তবে তাদের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। সভাসমিতি ডেকে জনসাধারণকে রেল-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল করবেন। (দৈনিক ইত্তেফাক)

ব্যাঙের ঠ্যাং

ব্যাঙের ঠ্যাং এখন আর তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়। বাংলাদেশ রফতানি উন্নয়ন পর্ষদের ধারণা শুধু ব্যাঙের ঠ্যাং রফতানি করে বাংলাদেশ বছরে ৫০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারে; ব্যাঙ রফতানি



লব্ধ আয়ের পরিসংখ্যান: ১৯৭২-৭৩: ১১.৬৬ লাখ টাকা, ১৯৭৩-৭৪: ২৪.৩৭ লাখ টাকা, ১৯৭৪-৭৫: ১ কোটি ১৮ লাখ ২১ হাজার টাকা, ১৯৭৬-৭৭: ১ কোটি ৫২ লাখ টাকা, ১৯৭৭-৭৮: ২ কোটি ১৪ লাখ টাকা, ১৯৭৮-৭৯: ৯ কোটি টাকা।

(বাংলাদেশ অবজারভার)

অথ দফতর কথা

বগুড়ায় জেলা সম্প্রসারণ অধিকর্তার অধীনে কৃষি-তথ্য অফিস থাকলেও কৃষি-তথ্য আধিকারিক নেই। তাই বিনা কাজে বেতন মিলছে চলচ্চিত্র টেকনিশিয়ান আর গাড়ির ড্রাইভারের।

এর ঠিক বিপরীত চিত্র মৎস্য দফতরে। জেলা মৎস্য সম্প্রসারণ অধিকর্তা আছেন। কিন্তু তার কোন অফিসঘর-কেরানী-পিওন নেই। বগুড়া জেলায় সরকারী অফিসগুলির অধিকাংশেরই হাল এরকম।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

করপোরেশন বাস

ঢাকা পৌর করপোরেশন শহরে মিনিবাস ও ট্যাক্সি সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য ৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ২০০ মিনিবাস এবং ৫০টি ট্যাক্সি বিদেশ থেকে আমদানি করা হবে।

ট্যাক্সি সার্ভিস কয়েকটি এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকলেও বাস সার্ভিস শহরের সব প্রান্তেই ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

(দৈনিক বাংলা)

উবাচ

ইসলাম একটা গতিশীল ধর্ম। ইসলামী সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের ধারণাটি মার্কসবাদের চাইতেও বাস্তবধর্মী ও প্রগতিশীল: প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান।

(দৈনিক বাংলা)

আদর্শ

পুবালী ব্যাংকের পীলখানা শাখার হেড পিয়ন নুরুল ইসলাম সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়েছে। অভিযোগ ১০ লাখ টাকা আত্মসাৎ। পুলিশ নুরুল ইসলামের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে অপহৃত ১০ হাজার টাকা, মূল্যবান সম্পত্তি এবং জমি কেনার দলিল। কিন্তু কেন এই চুরি?

নুরুলের সাফ জবাব: দীর্ঘদিন ব্যাংকের বড় কর্তাদের টাকা আত্মসাতের ঘটনা লক্ষ্য করছি। তাই হাতে কলমে—

নুরুল ইসলাম নাম ভাঁড়িয়ে বিভিন্ন ব্যাংকে জমা করেছে বিভিন্ন অংকের টাকা। ভোলা সোনালী ব্যাংকে ৬৫ হাজার, মতিঝিল উত্তরা ব্যাংকে ১৫ হাজার, অগ্রণী ব্যাংকে ৫০ হাজার টাকা জমা রেখেছে। এ সবই ঐ টাকারই অংশ। (দৈনিক ইত্তেফাক)

অলৌকিক

দৌলতখানা থানার মহম্মদ আফিজ-উদ্দিনের ইন্তেকাল হয় গত রমজানের ২৭শে। বেড়ি বাঁধের কাছে দাফনও করা হয়। এ বছরের ১৩ই রমজানের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আফিজউদ্দিনের কবর ভেঙে লাশ আটকে থাকে পানের বাগানে। গ্রামবাসীরা কাফনের কাপড় খুলে অবাক! মৃতদেহ তেমনি অবিকৃত এবং কাফনের কাপড়ও ধবধবে সাদা! পুনরায় জানাজা করে মৃতদেহ অন্যত্র দাফন করা হয়।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

সেজেগুজে রইলাম বসে

অসট্রেলিয়া থেকে ভেড়া আসবে। তাই



লাখ টাকা খরচ করে সোনাগাছিতে গত দশ বছর ধরে চলছে খামার তৈরির কাজ। সে কাজও প্রায় শেষ। কিন্তু দেখা নেই যাদের জন্যে তৈরি হল খামার—অসট্রেলিয়ার সরকারী উপহার দুশ' ভেড়া।

১৯৭০ সালে অসট্রেলিয়া সরকার এই ভেড়া উপহার দেন। কিন্তু পরিবহন ব্যয় ৭০ হাজার টাকা হওয়ায় ভেড়া আনার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। অথচ ভেড়ার খামার তৈরি ইত্যাদি আনুষঙ্গিক প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং কাজও শুরু হয় সেই ভাবে…।

(দৈনিক বাংলা)

ঈদের চিনি

ভৈরবে ঈদের জন্যে সরকারী বরাদ্দ ৩৮৫ মন চিনি আজও বিলি হয়নি। সেই চিনির কোন হদিশ মিলছে না। যে ডিলারের নামে এই চিনি বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারও কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের এই চিনি কালোবাজারে বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। (দৈনিক বাংলা)

প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) ৪০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে এই খাতে।

প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তকও সরবরাহ করা হবে সরকারী খরচে। (বাংলাদেশ অবজারভার)

নেই, নেই, নেই

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৪০ হাজার তাঁতি কাজ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। তাঁত আছে কিন্তু সুতো নেই। সরকারী সূত্রের খবর: গত বছর দুয়েক থেকে ২৩ জন সুতো বিক্রেতার ১৭ জনই ১০৫ বেল বিভিন্ন ধরনের সুতো তুলেছেন কোকিল টেকসটাইল মিল থেকে এবং সেই সুতো তাঁতিদের কাছে পৌঁছয়নি। বিক্রি হয়ে গিয়েছে নরসিংদি, গোপালদির কালোবাজারে।

মাগুরায় সিমেন্ট নেই। তাই কি সরকারী কি বেসরকারী সব উন্নয়নের কাজই ব্যাহত হচ্ছে। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী সরবরাহ একান্তই অপ্রতুল! সিমেন্টের অভাবে বেকারী বাড়ছে জনমজুরদের মধ্যেও।

রাজশাহীর নওগাঁর প্রধান উৎপাদনই মাছ। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুকুর, দীঘি এবং যমুনা নদীর মাছ এ অঞ্চলের অধিবাসীদের আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু এখানে মাছ কেনাবেচার একটা ভালো বাজার নেই। (বাংলাদেশ টাইমস)

মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাঁতের যন্ত্রনা হ'ত,
তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন ?
আপনার দাঁতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন !

নতুন প্রমিস

এক অদ্বিতীয় টুথপেষ্ট
যাতে আছে চিরকালের ব্যবহৃত লবঙ্গের তেল!



লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপেষ্ট

১.
দাঁতের ক্ষয়
নিবারণ করতে
সাহায্য করে।



২.
মুখের ভেতর
তাজা রাখার দরুন
নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ
হতে দেয় না।



সুস্থ সবল দাঁত ও মাড়ি
আর তাজা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে...প্রমিস!

CHAITRA-BLS-369 BEN

"কেবলমাত্র কলকাতা ও হাওড়ায় পাওয়া যাচ্ছে।"

এই পক্ষ

(জানুয়ারি ১ থেকে ১৫)

মেষ : শরীর চলনসই। ধনভাব আশাপ্রদ নয় ; সঞ্চিত ধনে টান পড়তে পারে। কর্মস্থলে স্থিতাবস্থা চললেও ছোটখাট ঝামেলা বিব্রত করবে। আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। পারিবারিক ক্ষেত্রে মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে সর্তকতা প্রয়োজন। অবিবাহিতদের বিবাহ ব্যাপারে নতুন যোগাযোগ। কোন গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। ব্যবসায়ীদের বিশেষ কোন ঝামেলার হঠাৎ অবসান। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার নতুন উদ্যমে বাধা।

বৃষ : শরীর ভালই চলবে। ধনভাব শুভ ; সঞ্চয় হবারও সম্ভাবনা। কর্মস্থলে একক প্রচেষ্টায় কোন সমস্যার সমাধান। আয় বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বজন বিরোধ। কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের কোন ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা/মোকদ্দমা বিব্রত করতে পরে। গৃহাদি ক্রয়ে বাধা। সন্তানদের কারও জন্য দুশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের অপেক্ষাকৃত শুভ সময়। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে অসাফল্য।

মিথুন : ছোটখাট অসুস্থতা শরীরকে বিব্রত করবে। সঞ্চিত ধন বৃদ্ধি। কর্মস্থলে শত্রুতা সক্রিয় হলেও পদমর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে। আয়বৃদ্ধি আশা করা যায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে নতুন কোন অশান্তি ভীষণ আকার নিতে পারে। কর্মস্থলে মেয়েদের ভেবেচিন্তে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দরুণ দুশ্চিন্তা। সন্তানদের সময় অশুভ। বিশেষ কোন কর্ম প্রচেষ্টায় বাধা। ভাই/বোনদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি।

কর্কট : শরীর ভাল চলবে। ধনভাব অশুভ ; নানাভাবে সঞ্চিত ধনক্ষয়। কর্মস্থলে পক্ষের মাঝামাঝি নতুন কোন সুযোগ আসতে পারে। আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে অন্যের মতকে প্রাধান্য দিলে ক্ষতি হতে পারে। কর্মস্থলে মেয়েদের সুনাম বৃদ্ধি। বন্ধুদের এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাল। অবিবাহিতদের প্রেম-প্রণয় ইত্যাদি ব্যাপারে অসাফল্য। ভাইবোনেদের দ্বারা ক্ষতির আশংকা। ব্যবসায়ীদের সময় শুভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার সম্মানবৃদ্ধি।

সিংহ : শরীর অশান্তির কারণ হবে। ছোটখাট দুর্ঘটনায় আশংকা। ধনভাব অশুভ ; ব্যয়ের চাপের দরুণ মানসিক অশান্তি। কর্মস্থলে পুরনো বিরোধের অবসান ও নতুন কোন সম্মানলাভ। বিভিন্ন সূত্রে আয়বৃদ্ধি হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান অন্যের পরামর্শ সহায়ক হবে। কর্মস্থলে মেয়েদের কারও ওপরে বিশেষ নির্ভরতা ঝঞ্ঝাটের কারণ হতে পারে। সন্তানদের সময় শুভ বিশেষ কোন প্রচেষ্টা সফল হবে। ব্যবসায়ীদের নতুন ঝামেলা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মানসিক অবসাদ।

কন্যা : ছোটখাট অসুস্থতা বিব্রত করবে। ব্যয়ের চাপ চলবে ও বাড়বে। কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বীকৃতি-লাভ। আয়বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য নয়। মেয়েদের কর্মস্থলে উন্নতির আকস্মিক সুযোগ আসতে পারে। জমি-জমা ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে অশান্তি। বন্ধুদের ওপর সবক্ষেত্রে নির্ভর করা ঠিক হবে না। অবিবাহিতদের বিবাহ বিষয়ে অশান্তি ঝঞ্ঝাট। কোন ব্যাপারে সংযম একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্যবসায়ীদের সময় শুভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার আর্থিক সাফল্য।

তুলা : অম্বল ও বাত ভালমত কাবু করবে। ধনভাব শুভ ; ভালরকম সঞ্চয় হতে পারে। কর্মস্থলে কোন বিষয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। নানাভাবে আয়বৃদ্ধি আশা করা যায়। কর্মস্থলে মেয়েদের সামান্য কোন বিষয় নিয়ে অশান্তি। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর পরামর্শ সুখের হবে। সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা। স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য। ফাটকা ব্যাপারে ক্ষতি। ব্যবসায়ীদের নতুন উদ্যোগে বাধা। এই লগ্নের জাতক জাতিকার আঘাত-প্রাপ্তি।

বৃশ্চিক : শরীর ভাল চলবে। পুরনো রোগের অনেকটা উপশম হবে। ধনভাব শুভ ; সামান্য সঞ্চয় আশা করা যায়। কর্মস্থলে পদমর্যাদা বৃদ্ধি। ভাল নতুন কোন সুযোগ আসতে পারে। বিশেষ কোন সূত্রে ভালরকম আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা কর্মস্থলে মেয়েদের নিজ সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা প্রয়োজন। পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরনো বিরোধের নিষ্পত্তি। স্বজনেরা সখ্য স্থাপনের চেস্টা করবে। বিবাহেচ্ছুদের ভাল বিবাহযোগ। ব্যবসায়ীদের বকেয়া আদায় হবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার অর্থনাশ।

ধনু : মানসিক অবসাদ বিব্রত করবে। ব্যয়ের চাপের দরুণ আয়-ব্যয়ে সমতা রাখা মুশকিল হবে। কর্মস্থলে কারও অযাচিত সাহায্য নিজের পদমর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। আশানুরূপ আয়বৃদ্ধি। কর্মস্থলে মেয়েদের স্থিতাবস্থা চলবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বজনদের মতামত সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি। অর্থ-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। ভ্রমণে ও ধর্মকর্মে বাধা। ব্যবসায়ীদের সময় ভালো। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মানসিক অশান্তি।

মকর : শরীর নিয়ে অশান্তি। আয়-ব্যয় ফারাক ভীষণ রকম বাড়বে। কর্মস্থলে উপস্থিত কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। তাহলেও নানাভাবে আয় বাড়তে পারে। অবিমৃষ্যকারিতা মেয়েদের কর্মস্থলে ঝঞ্ঝাট আনবে। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ ; অনেক পুরনো বিরোধের অবসান। জমি-জমা ক্রয়ের আকস্মিক সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুদের দ্বারা প্রতারিত হবার আশংকা। সন্তানদের কারও জন্য মনস্তাপ। ব্যবসায়ীদের লাভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ভ্রমণ।

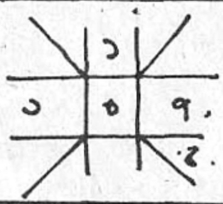
কুম্ভ : শরীর নিয়ে অশান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে। ধনভাব অশুভ ; অল্পবিস্তর সঞ্চয়ও আশা করা যায় না। কর্মক্ষেত্রে হারানো মর্যাদা ফিরে পাওয়া যাবে। আয়বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হলেও ব্যয়ের চাপ চলবে। কর্মস্থলে মেয়েদের শুভ যোগাযোগের সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে সন্তানদের জন্য অশান্তি। কোন বন্ধুর দ্বারা আর্থিক সাহায্য লাভ। ভৃত্যরা ক্ষতি করতে পারে। মেয়েদের বিশেষ কোন ইচ্ছে পূর্ণ হবার সম্ভবনা। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার অর্থক্ষতি।

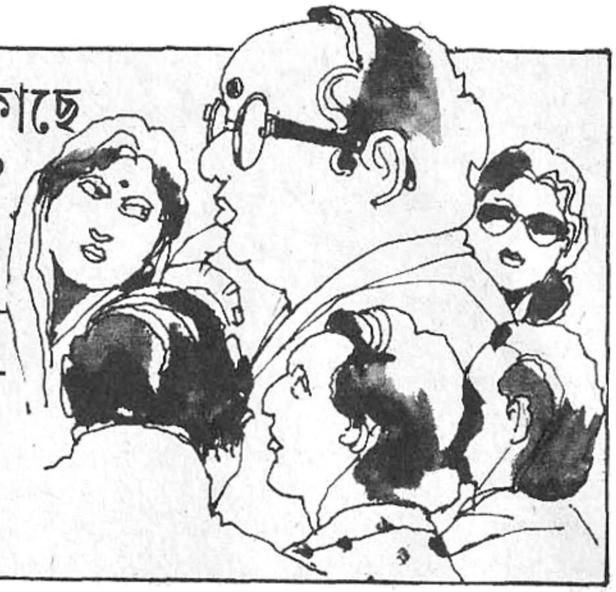
মীন : মানসিক অবসাদ ভাল রকম কাবু করে ফেলতে পারে। ধনভাব শুভ ; সঞ্চয় ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দেবে। কর্মস্থলে নতুন কোন সুযোগ গ্রহণ করলে লাভ হবে। মেয়েদের কর্মস্থলে সংযম প্রয়োজন। আয়বৃদ্ধি আশা করা যায়। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ ; ছোটখাট সমস্যা এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল। কোন ভাই/বোনের আচরণ ব্যথিত করবে। জমি-জমা ক্রয় বিক্রয়ে বাধা। অবিবাহিতদের বিবাহ ব্যাপারে নতুন যোগাযোগ ফলপ্রসূ হবে। ব্যবসায়ীদের লাভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার স্বজন বিরোধ।

শ্রীভট্ট

জ্যোতিষীর কাছে কারা আসে ? কী চায় ?

শিবশংকর ভারতী





করি জ্যোতিষ চর্চা। শুধু নেশা নয়, পেশা হিসাবেই। সেই সুবাদে সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের সান্নিধ্য পাই। জ্যোতিষীর কাছে এসে মানুষ তার মন খুলে ধরে জানতে চায় ভবিষ্যৎ, পেতে চায় আশ্বাস। সমাজের কোন ধরনের মানুষ কী ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আসে তারই একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করছি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে।

ক্যানসার রোগাক্রান্ত এই সমাজের হতাশা নৈরাশ্য ও দুর্দশাগ্রস্ত ২২ থেকে ৩২ বৎসর বয়স্ক ক্রনিক বেকার যুবকদের শুকনো আরবী খেজুরের মতো মুখ থেকে একটি প্রশ্নই বেরিয়ে আসে, 'আর পারছি না দাদা, অনেক চেষ্টা করে একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছি। কোন পার্টি করি না বলে চাকরি হলো না। এই-ভাবেই কি সারাটা জীবন কুকুরের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে ? আমি কি কোন দিনও দাঁড়াতে পারবো না ? আমার কি শনিটা খারাপ ?

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে—নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এক কথায় সব শ্রেণীর প্রশ্ন একই—বাঁচার।

তবে এদের মধ্যে ২২ থেকে ২৯ বৎসর বয়স্ক বেকারদের অধিকাংশেরই ল্যাজে আগুনের মতো আর একটি প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, 'একটা মেয়েকে প্রাণ মন ভালোবাসি। বেকার বলে কিছু করতে পারছি না। ও হাত-ছাড়া হবে না তো।'

১৬ থেকে ২২ এর মধ্যে ছেলেমেয়ে উভয়পক্ষই আছে। অধিকাংশেরই প্রশ্ন প্রেমপ্রীতি বিষয়ক। যেমন, 'শ্যামলীকে না পেলে জীবনটাই বৃথা হয়ে যাবে। ওর সাথে বিয়ে হবে কিনা দয়া করে একটু বলুন।'

প্রেম-প্রীতির সাধারণ প্রশ্ন ছাড়াও কত বিচিত্র সমস্যা মানুষকে কত কষ্ট দেয় তার দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

একবার এক ভদ্রলোক এলেন। বয়স ৪৮ বৎসর। কলকাতার কোন একটি ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মচারী। তার প্রশ্ন ছিল এই রকম :

'দেখুন, অতীতকে নিয়েই আমার ভবিষ্যতের প্রশ্ন। তখন আমার বয়স ১৮/২০ হবে। স্থানীয় একটা মেয়েকে ভালোবেসে ফেললাম। মেয়েটি সুন্দরী শিক্ষিতা। জাতিগত ব্যাপারে কোন বাধা ছিল না। বাধা দিলেন বাবা মা। কারণ তারা চাননি আমি প্রেম করে বিয়ে করি। তাই আন্তরিক ভালোবাসা সত্ত্বেও তাদের পছন্দে মত দিই। অবশ্য তাদের অমতে বিয়ে করে কষ্ট দেবার ইচ্ছাও আমার ছিল না।

মেয়েটির বয়স আজ ৪২/৪৪। আমার জন্য আজও সে বিয়ে করেনি। আমার স্ত্রী পুত্র আছে। সাংসারিক কোন অভাবই আমার নেই। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আমার দীক্ষা হয়েছে। আজ আমার শুধু একটিই প্রশ্ন, মেয়েটি আমার জন্য তার জীবনটাই নষ্ট করে ফেললো। তার কষ্ট আমি প্রতি মুহূর্তে অন্তরে অনুভব করি। এই যে তার ব্যথা ভরা নিঃশ্বাস—এটা আমার অধ্যাত্ম-জীবনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে ? সত্যিই কি আমি অপরাধী ? আমি কি পারবো না অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছাতে ?'

সমস্যায় বিব্রত হয়ে ছুটে এসেছিলেন ৩২ বৎসর বয়স্ক এক যুবক। ব্যানারজি। সাথে প্রেমিকা বিহারী মুসলমান কন্যা। বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আপনিই বলুন না, একে কি সুন্দরী বলা যায় ? তবুও আমি একে ভালোবাসি। এর জন্যে আমার সমাজ সংসার—সব কিছুই গেছে। সম্পর্ক আমাদের স্বামী স্ত্রীর। এখন'ও আমাকে বিয়ে করার মনোভাব নিয়েছে। আপনি একটু বলুন, এর সঙ্গে আমার বিয়েটা হবে তো ? তবে এটাও জানবেন, ও যদি আমাকে বিয়ে করে তবে ওকেও আমি বাঁচতে দেব না।'

১৮ থেকে ৩৩ এর মধ্যে বয়েস এমন মেয়েদের মধ্যে কয়েকটা ভাগ আছে। কিছু মেয়ে বাড়ির মুখ চেয়ে কড়িকাঠ গুনছে। প্রশ্ন তাদের একটাই, দেখুন না, কত বয়েস হয়ে গেল। তথ্যকেন্দ্র আর বিজ্ঞাপনে বাবার ক্যাপিটাল শেষ। কিন্তু কোন ভালো ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি বা ছিটে ফোঁটা মেলে তাদের কাছে ঘেঁষার উপায় নেই—শুধু টাকার খাঁই। তাই আমাকে কি এইভাবেই সারা-জীবন শিবের উপোস করে যেতে হবে ?'

উক্ত বয়েসের মধ্যে অনেকেই আবার আমাদার চাটনি হয়ে আছে। রেজিসট্রিও করা আছে কিছুর। প্রশ্ন ওই একই. 'যার সঙ্গে আছি তার সঙ্গেই হবে কিনা দয়া করে একটু বলুন। কারণ আজকাল ছেলেদের মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।'

এ'প্রশ্ন নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে ধনী ঘরের মেয়েদের মুখ থেকে হামেশাই শুনতে হয়।

তবে এর মধ্যেও কিছু মেয়ে উঠে পড়ে লেগেছে—'বিয়ে হোক বা না হোক—চুলোয় যাক। নিজের পায় দাঁড়াতে চাই—চাকরিটা কবে হবে ?'

সবচেয়ে সমস্যা বেশি দারিদ্র্যের অক্টো-পাসে বাঁধা নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের। এদের বয়স ৩৬ থেকে ৬২'এর মধ্যে। অধিকাংশেরই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে আর্থিক সঙ্কটে পারিবারিক অশান্তি।—একই সঙ্গে জড়িত প্রশ্ন. 'ছেলেপুলেরা মানুষ হবে তো—একদম পড়াশুনা করতে চায় না। মেয়েদের অনেক বয়েস হয়ে গেল, বিয়ে দিয়ে যেতে পারবো তো ? কবে থেকে আর্থিক উন্নতি হবে ?' ইত্যাদি।

নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই এ'প্রশ্ন। তবে বিবাহিতাদের আবার, 'আমি ওর আগে যেতে পারবো তো ?'

আজকাল জ্যোতিষীরা ছেলের মেয়ের সঙ্গে কনের যোটক বিচার করেন না বলে অধিকাংশ ঘরের মায়েদের প্রশ্ন, 'ছেলের বিয়ে দেয়ার পর থেকেই কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। বউ তুক করে ছেলের মন ঘুরিয়ে দিয়েছে। এখন আমি হয়েছি চোখের বিষ—বউ হয়েছে মাথারমণি। ওই একমাত্র ছেলে। আমাকে দুটো খেতে দেবে তো ?'

উচ্চ মধ্যবিত্ত বা ধনী ঘরের আর্থিক ব্যাপারে প্রশ্ন একান্তই গৌণ। এদের অধিকাংশ বিবাহিতাদের প্রশ্ন থাকে এই ধরনের, 'দেখুন, উপর দিকে থুথু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে। তবুও না বলে পারছি না। উনি আমার কোন অভাবই রাখেননি।

অথচ অভিশপ্ত জীবন আমার। আমার স্বামী প্রতিদিন ড্রিংক করে বাড়ি ফেরেন। আর আমি নিজের চোখে দেখেছি—একদিন নয়, বহুদিন—আমার বাড়ীর ঝি'এর সঙ্গে আমারই বিছানায় শুয়ে আছে আমার স্বামী। এটা কোন স্ত্রী সহ্য করতে পারে—আপনিই বলুন? আমার স্বামী কি কখনো ভালো হবে না? আমি কি পাবো না তার অকৃত্রিম ভালোবাসা? এইভাবেই কি সারাটা জীবন জ্বলে পুড়ে মরতে হবে?'

বিপরীতভাবে অধিকাংশ স্বামীর অভিযোগ, 'দেখুন, অনেক সহ্য করেছি, আর সম্ভব নয়। আপনি যদি বলেন মামলায় জিতবো তবেই আমি ডিভোর্স কেস করবো। কারণ দ্বিতীয় বাচ্চাটা আমার নয় বলেই বিশ্বাস।'

২৮ থেকে ৪৫ এর মধ্যে কিছু ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী এবং একটা শ্রেণী আছে যারা ভারত বাংলাদেশ এবং ভারত নেপাল বর্ডার দিয়ে মাল পাচার করে। এদের নির্লিপ্ত প্রশ্ন, 'দেখুন দাদা, ডাক্তার উকিল আর জ্যোতিষীর কাছে মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই। আমি স্রেফ দু'নম্বরী কারবার করি। এবার হেভি টাকার মাল পাঠাচ্ছি। কোন পুলিশী ঝামেলা বা মাল চোট যাবে না তো?'

এদের প্রতিষ্ঠা বা সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

আদর্শ মায়েরা এসে বলেন: 'দেখুন, ছেলেটা যদি ভালো হতো তাহলে আমাদের কোন আপত্তি থাকতো না। মেয়েটাকে কত করে বোঝাচ্ছি কিন্তু কিছুতেই গোঁ ছাড়ছে না। পাড়ার একটা নচ্ছার ছেলের সঙ্গে কিছুতেই মেলামেশা বন্ধ করাতে পারছি না। আপনি এমন কিছু একটা শিকড় বাকড় দিন যাতে মেয়েটার মনটা ঘোরে।'

প্রশ্ন করেন সম্ভ্রান্ত গৃহবধূ, 'অনেক চেষ্টা করেও ওর মদের নেশা ছাড়াতে পারলাম না। অফিস থেকে ফেরার পথে মদ না গিলে বাড়ি ঢোকে না। ছোট ছেলেটারও বাপের মতো নেশা হয়েছে। এর কি কোন প্রতিকার নেই?'

আবার রাবণের ছোট্ট আদুরে বোন শূর্পনখার মতো চেহারার অনেক মেয়েরই প্রশ্ন, 'আমার সাথে যার বিয়ে হবে তাকে দেখতে সুন্দর আর স্মার্ট হবে তো? ক্যাবলা ক্যাবলা বোকা বোকা ছেলেদের একদম ভাল লাগে না। আমার স্বামীর পয়সা হবে তো?'

চালনীর মতো ঝাঁঝরা করা বুক আর থ্যাতলানো পেটের রুগীই বেশি। ডাক্তার-ফেরত হয়ে জ্যোতিষীর কাছে আসে, রক্তে রোগ নিরাময়ের জন্য।

এছাড়াও আরও একটা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। যেমন, 'অনেক চেষ্টা করেও দাদা নিজেকে কনট্রোল করতে পারছি না। সপ্তায় তিনদিন বেশ্যা বাড়ি যাই। এমন কোন গ্রহরত্ন দিন যাতে এর হাত থেকে মুক্তি পাই।

আবার ৬৫ বৎসর বয়স্ক এক ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, 'এমন কোন গ্রহরত্ন, তাবিজ কবচ কিংবা এমন কিছু একটা দিন—যাতে যে কোন বয়েসের যে কোন রমণী বশীভূত হবে অব্যর্থভাবে।'

সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় দেখেছি সমাজের শতকরা আশি ভাগ নারী পুরুষ অবৈধ প্রেমে লিপ্ত। কেউ বন্ধুর বউ, কেউ শালী, কেউ বা পাড়ার বউদি—সধবা, বিধবা কুমারী—এক কথায় এই আশিভাগের মধ্যে কেউ না কেউ কারো না কারো সঙ্গে লেপটে আছেই—কম আর বেশি। এসব দেখে শুনে আজকাল বিয়ে করতেই ভয় হয়। এদের সমস্যা বেশি মারাত্মক নয় তবে উদ্বেগজনক—লোকভয়, 'দেখুন, এ'রকম একটা ব্যাপারে ফেঁসে আছি। মনের দিক থেকে কিছুতে ছাড়তে পারছি না। এটা লোক জানাজানি বা পরে কোন অসুবিধেয় পড়তে হবে না তো?'

এদের অবৈধ সম্পর্কে আসা উদ্বৃত্ত ফসলের ক'জন যে প্রকৃত পিতার পরিচয় দিতে পারবে—তা মহাকালই বলতে পারে। কোন জ্যোতিষের বাপের ক্ষমতা নেই এদের কাউকেই রাশিচক্রের দ্বাদশ ঘরে আনতে পারে।

এসেছিলেন বড় বাজারের সুপুরী ও লবঙ্গের পাইকারী এক ব্যবসায়ী। বয়স ৫৬। সঙ্গে শালী, বয়স ২৫/২৬। সুন্দর সুঠাম দেহ। বিবাহিতা। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'এ' আমার ছোট শালী। আমি



একে ভালোবাসি। আগে আমাদের প্রেমে নোংরামী ছিল। অর্থাৎ দেহগত যে একটা ব্যাপার—সেটা ছিল। এখন আর নেই। আমি চাই এ' আমাকে সারা জীবন ভালো-বাসুক—এ' আমাকে ভালোবাসবে তো? এর জন্যে আমি সর্বাকছুই করতে রাজি আছি…'

কিন্তু মেয়েটি জামাইবাবুর আড়ালে বলে-ছিলেন, 'দেখুন, আমার স্বামী সদাশিব। একটু উদাসীন। আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন। কিন্তু আমি তাকে কেন জানি না ভালোবাসতে পারছি না। আমার একটি মেয়ে আছে। আমি চাই আমার স্বামীকে ভালোবাসতে—চাই সুখী হতে। আমি কি সুখী হতে পারবো না? আমি বড্ড অসহায়—আমার বাঁচার পথ বলে দিন।'

অনেক ধনী ঘরের মেয়েরা আজকাল বাঙালী যুবকদের বিশেষ পছন্দ করে না। তারা পানজাবি, মুসলমান কিংবা মারোয়াড়ি ছেলেদের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

যেমন একবার এসেছিলেন কালিদাসের কলমের শকুন্তলা। সত্যিই শকুন্তলা। যৌবন যেন উপচে বেরোচ্ছে। তবে চরিত্র ও নামে শকুন্তলার সঙ্গে মিল নেই—নেই দুষ্মন্তের সঙ্গে প্রেম। বয়স আন্দাজ ২৫/২৬। বাঙালী। এয়ার হোসটেস। সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন:

'দেখুন, প্রেমের প্রীতি উপহার দিয়েছি ছ-ছবার এবরশান করে। আর কতবার দিতে হবে? ছেলেটি জাতিতে পানজাবি। আমাকে বিয়ে করবে না তো?'

সমাজে সৎলোকের যেমন অভাব নেই—তেমনি অভাব নেই তাদের সমস্যার। এদের অনেকেই বলেন, 'আচ্ছা সততার কি কোন মূল্যই নেই। আমি একটা পয়সাও ঘুষ খাই না, আর কাউকেই পাম অয়েলও মাখাই না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি বলে অফিস স্টাফরা ইউনিয়ানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে ভাগাড়ে ট্রানসফার করেছে। আমি আবার কবে কলকাতায় আসতে পারবো দয়া করে একটু বলুন।'

তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অন্যায়ভাবে প্রমোশন আটকে রাখা এবং উলটোপালটা জায়গায় ট্রানসফারের হাত থেকেও মুক্তি পাওয়ার আশায় ছুটে আসে জ্যোতিষীর কাছে।

তন্ত্রগন্ত্র ফুঁকফাক আর ডাকতার কোবরেজ হজম করে অনেক নারী পুরুষ ছোটে জ্যোতিষীর কাছে, 'বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় দশ বছর। এখনো কোন বাচ্চা হলো না। ডাক্তারি রিপোর্টে কোন অসুবিধা নেই। কুষ্ঠিটা একটু দেখুন তো, কোন সন্তানের যোগ আছে কি না?'

অতৃপ্ত যৌন জীবন যাপন করছেন এমন অনেক নারী পুরুষের মধ্যে একবার এক ৩২ বৎসর বয়স্কা ভদ্রমহিলা শুরু করেছিলেন এইভাবে, 'সাংসারিক কোন কষ্টই আমার নেই। কষ্ট আমার দেহকে নিয়ে। আমার বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় পাঁচ বছর। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আজ পর্যন্ত আমি স্বামী সহবাসে আনন্দ পাইনি—পাইনি পরিতৃপ্তি। মাঝে মাঝে মনে হয় অন্য কারো সঙ্গে চলে যাই। কিন্তু সমাজে অনেক বাধা—তাই পারি না। আপনি এমন কোন গ্রহরত্ন দিন যাতে আমার যৌনজীবন সুন্দর ও মধুময় হয়ে ওঠে।'

আবার ৬৮ বৎসর বয়সের দাঁত পড়া বে-আক্কেলে বুড়োর মুখেও শুনেছি, 'দেখুন, টাকা পয়সা আমার যা আছে—এখন পাঁচ ছ' পুরুষ বসে খেতে পারবে। কিন্তু আমার সব সময়ই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। আমি চাই আ-মৃত্যু নারী ভোগ করবো। কিন্তু আমার সেক্স জাগে না। আপনি এমন কোন গ্রহরত্ন দিন যাতে যুবকদের মতো ক্ষমতা ফিরে পাই। ইনজেকশান নিয়েও কোন সুফল পাইনি। দাম যতই হোক না—টাকার জন্য চিন্তা নেই।'

কিছু ধনী ক্রিমিনালদের ধারণা জ্যোতিষীরা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপাদিও কিছু জানে। তারা আসে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আইনের হাত থেকে মুক্তি পেতে। এর জন্য টাকার পরোয়া নেই। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কলকাতা হাইকোর্টের বড় বড় মামলার অধিকাংশ আসামীরা তান্ত্রিক জ্যোতির্বিদের পায়ের ধুলো রাখে না।

সবচেয়ে মজা হলো একটা মোর্চা নিয়ে। সাহিত্যিক, কবি, পুলিশ, গৃহস্থঘরের বউ, সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার থেকে শুরু করে প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং কলেজের ছাত্র শিক্ষক পর্যন্ত—সবশ্রেণীরই কিছু কিছু আছে এই মোর্চাতে। ১৪ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে বয়স। সামান্য অর্থের বিনিময়ে জ্যোতিষীর কাছে একটি প্রশ্ন, 'কয়েক সপ্তা ধরে খুব মার খাচ্ছি। কলাবাগান আর ভূতনাথ এক নম্বর চোর—বোমবে অতটা না। আপনি আজকের দিনটা একটু ক্যালকুলেশান করে দেখুন, কোন অর্থপ্রাপ্তির যোগ আছে কিনা? যদি থাকে তবে সাট্টায় আজ মোটা টাকা লাগাব।'

জ্যোতিষের কাছে এ যুগের সবচেয়ে বড় উপসর্গ হলো কিছু অশিক্ষিত বেকার এবং স্কুল ফাইনাল ফেল যুবকদের নিয়ে। এদের অধিকাংশেরই এক জিজ্ঞাসা—গাড়ি বাড়ি সুন্দরী স্ত্রী এবং বিদেশ ভ্রমণ হবে কিনা? তাছাড়া হিন্দি সিনেমার নায়ক হওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করে অনেকে।



কিছু কিছু রাজনীতিবিদ মন্ত্রী এবং এম এল এ—এদের অনেকেই মুখে বা মনেপ্রাণে ঈশ্বর বিশ্বাসী না হলেও জ্যোতিষের ভক্তদাস। অধিকাংশেরই কোঁচার খুঁটে একটা করে জ্যোতিষী বাধা। কখন কেমন পজিশন থাকবে এবং কোন তারিখটায় কাজ সাকসেস-ফুল হবে তা পরামর্শ না করে ওরা জল ছোঁয় না। ইলেকশানের আগে বেশ মজা দেখা যায়। এমনও অনেক মন্ত্রী এবং এম এল এর স্ত্রীর-কথা শুনেছি—যারা তার স্বামীর পজিশান অটুট রাখতে শক্তিমান তান্ত্রিক জ্যোতির্বিদের পায়ে নিয়মিত ফুল বেলপাতা দেন।

জ্যোতির্বিদ হিসাবে আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো যখন গর্ভবতী কুমারী মায়েদের দিন গণনা করে বলে দিতে হয় যেদিন গর্ভপাত করলে কোন ক্ষতি অথবা বিভ্রান্তি-কর অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে না।

ধর্মীয় জীবনে উন্নতি হবে কিনা—এমন প্রশ্ন বিগত পনেরো বছরে মাত্র তিনজনের মুখ থেকে শুনেছি।

এছাড়াও পৃথিবীর এমন কোন প্রশ্ন নেই-যা জ্যোতিষীর কাছে এসে না করে—ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়াশোনা করে নোবেল প্রাইজ পাবে' কিনা—এমন প্রশ্নও নিয়ে এসেছে আজকের রবীন্দ্রনাথ। আর কদিন পর হয়তো দুটো কাপড় দান করা ভদ্রমহিলার মুখ থেকে শুনতে হবে— দেখুন তো মা টেরেসা হতে পারবো কিনা?

তবে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি একটি মানুষও পাইনি-যে সুখী ও সমস্যাহীন। অজস্র জীবন জিজ্ঞাসার গন্ধমাদন নিয়ে এসেছে আমার কাছে—সুখের আশে।

সুখের সন্ধানে এসেছিল একটি ছেলে। নমস্কার জানিয়ে বসলো সামনের চেয়ারে। চোখ দুটো দেখে মনে হলো অনেক কথা বলতে চায় একবারে। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই বললো:

'দেখুন, আমার বয়স ২৯। বিয়ে করেছি। একটা মেয়ে আছে। বাড়ি মেদিনীপুর। দুটো ব্যবসা করি। কোন অভাব নেই। তবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মোটেই মনের মিল নেই। বিয়ের পর থেকেই অশান্তিতে ভুগছি। যাই হোক, কলকাতায় আমি মালপত্র কেনাকাটা করতে আসি। একবার আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে যায় প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে। তারপর থেকে কলকাতায় এলেই ওখানে যেতাম। এইভাবে দেড় বছর কেটে গেল। এক নাগাড়ে ওখানে যেতে থাকায় ওর ওপর কেমন যেন একটা টান এসে গেল। মনের অজান্তেই ওকে ভালবেসে ফেললাম। আমার সমস্ত অভাব ও মিটিয়েছে—যা আমার স্ত্রীর কাছ থেকেও পাইনি। এখন আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি দয়া করে একটু দেখুন, ওকে বিয়ে করলে সুখী হতে পারবো তো?'

কথাগুলো বলেই চুপ করে গেল। পাশেই বসা সুন্দরী একটি মেয়ে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। চোখ দুটো পটলের ফালি। সারা দেহ থেকে আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে। অগুনতি পুরুষের অত্যাচারেও দেহের কোথাও এতটুকু টোল খায়নি।

এবার মেয়েটি হাতদুটো এগিয়ে দিয়ে বললো, 'দেখুন, আমাদের কাছে বাবুরা এলেই বলে, 'তোমাকে আমি ভালবাসি। বিয়ে করতে চাই।' নেশার ঘোরে এরকম বলাটা বাবুদের একটা বিলাসিতা। তবে ও একটু অন্য ধরনের। কুলবধূ হওয়ার মতো যোগ্যতা আমার নেই। ওর সমাজ বা আত্মীয়রা এটা মেনে নেবে না। তাছাড়া আমার পেটে এখন তিনমাসের একটা বাচ্চা আছে। এটা ওর নয়। ও বলেছে সামনের সপ্তায় নারসিং-হোমে নিয়ে যাবে। আপনি যদি বলেন ওকে বিয়ে করলে ওর কোন অসুবিধে হবে না এবং পরে অশান্তিতে ভুগবো না—সুখী হবো, তবেই ওর সঙ্গে যাবো। নইলে যা করছি তাই-ই করবো। আপনি দয়া করে শুধু বলুন, আমি সুখী হতে পারবো তো?'

এই সুখের সন্ধানই তো মানুষের জীবনের শেষতম পরম প্রত্যাশা। তাই বুকে নিয়ে ছুটে চলেছে দুর্বার গতিতে। কিন্তু জ্যোতিষ কি প্রকৃতই পারে সেই নিবিড় সুখের সন্ধান দিতে? ★ ছবি এঁকেছেন: জি সান্তা

এবার যারা অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন ● বি কে মুখোপাধ্যায়

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ১৯৬৯ সাল থেকে। ১৯৭৯ সালে এ পুরস্কারটি পেলেন দু'জন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ —প্রফেসর থিয়ডোর সুলজ ও স্যার আর্থার লুইস।

প্রখ্যাত আমেরিকান অর্থনীতিবিদ সুলজ 'হিউম্যান ক্যাপিটাল' ধারণাটির প্রধান প্রবক্তা। আর স্যার লুইস 'ডেভল্যাপমেনট প্ল্যানিং'-এর বাস্তবানুগ প্রয়োগের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। আনন্দের কথা: ওরা দু'জনেই উন্নতিশীল দেশগুলি সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাভাবনা করেছেন। তারা দু'জনেই জোর দিয়েছেন সেই বিষয়টার ওপর যা এইসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে রয়েছে। বিষয়টি হল কৃষি।

প্রফেসর সুলজের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হলো— Transforming Traditional Agriculture, Economic Growth and Agriculture, Economic Organisation of Agriculture প্রভৃতি। 'Food for the World' বইটি তারই সম্পাদিত। বইয়ের তালিকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে কৃষির ওপর তিনি কত গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তিনি 'উদবৃত্ত শ্রম' (Surplus Labour)-এর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কিছু পরিমাণ শ্রম তুলে নিলেও উৎপাদন নিম্নগামী হয় না, লুইস এ ধারণাতে বিশ্বাসী। উন্নতিশীল দেশগুলির কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে সুলজ দেখেছেন যে কৃষক সম্প্রদায় (শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভাবে নয়) হচ্ছে "Efficient but poor" তিনি বলেছেন কৃষকের অধীনে উৎপাদনের জন্য যে উপাদানগুলি থাকে সেগুলিই অদলবদল করে কৃষি উৎপাদনের মাত্রা। এ ধরনের চিরাচরিত কৃষিতে বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না। বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে প্রয়োগ করা। তা না হলে সুসম সম্পদ বণ্টন ঘটতে পারে না। বাজারের গঠন তিনি ধরেছেন 'নিখুঁত'। তারই ভাষায়: এসব দেশে লভ্য সম্পদকে যেভাবে ব্যবহার করা হয় এবং তাতে যে ফল পাওয়া যায়, সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিবর্তনের কথা চিন্তা করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন 'Effort' এবং 'Capital'-কে তিনটি কাজে ছড়ানো: (১) Reproducible goods-এর পরিমাণ বাড়ানো, (২) Productive agent হিসেবে জনগণের উৎকর্ষ বাড়ানো এবং (৩) Productive arts-এর স্তরকে উন্নততর করা।

সুলজ Resource allocation সম্বন্ধে কৃষির কথা যেমন বড় করে তুলে ধরেছেন তেমনই শিক্ষাকেও খুব প্রাধান্য দিয়েছেন। Capital goods-এর বিনিয়োগ করলে যতটা ফল পাওয়া যাবে তদপেক্ষা সেই বিনিয়োগ অনেক বেশি ফল আনবে যদি তা সামাজিক শিক্ষার বিকাশে নিযুক্ত করা হয়। Education & Economic growth যেটা হেনরি সম্পাদিত 'Social Forces Influencing American Education' বইতে বেরিয়েছিল তা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। সুলজ এ ব্যাপারে সরকারকে বিশেষভাবে অগ্রণী হবার কথা বলেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেছেন বিস্তারিত ভাবে, 'The Role of Government in Promoting Economic Growth' রচনায়। একটি "Liberal View" নেবার কথা তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়ে গেছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ব্যাপারে সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। সব জিনিস সব সময়ে যে দেশের মধ্যেই কম মূল্যে পাওয়া যাবে এরকম ধারণা করার তিনি বিরোধী। Primary Exports-এর ওপর কম উন্নত দেশগুলি বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

লুইস ওয়েসট ইনডিজে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছেন বৃটিশ এবং আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তথা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে। প্রিনসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি বহুদিন সংযুক্ত। তার রচিত কিছু বিখ্যাত গ্রন্থরাজির মধ্যে The Principles of Economic Planning, Theory of Economic growth, Some Aspects of Economic Development, Economic Development with unlimited supply of labour, the Evoluation of International Economic Order, Industrialization and the Gold Coast উল্লেখযোগ্য।

সব চাইতে যে বিষয়টি তার আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো সেই উদবৃত্ত শ্রমের ব্যাপারটি। এ সম্পর্কীয় আলোচনা অর্থনীতিতে যে একটি বিশেষ দিগন্তের উন্মোচন করেছে তা বলা যেতে পারে। বিষয়টি পরে জি র‍্যানিস ও জি সি এইচ ফেই আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

ছদ্মবেকারত্ব উন্নতিশীল দেশগুলির কৃষি ব্যবস্থায় বিরাজমান বলে তিনি দেখিয়েছেন। এটা হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যেখানে একটি স্থির প্রকৃত মজুরীর বিনিময়ে কৃষি থেকে শ্রমের যোগান পাওয়া যায় বিরাট ভাবে। তবে তিনি 'নিখুঁত বাজার বিষয়ক ব্যাপারটি, 'শ্রম বিভাগের সুষম ব্যবস্থা' প্রভৃতিতে সুলজের সঙ্গে একমত নন।

লুইসের বিখ্যাত মডেলটি আলোচনা করলে উন্নতিশীল দেশগুলির উন্নয়ন সম্পর্কীয় বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা যাবে। দুটি সেকটর নিয়ে তিনি তার মডেল আরম্ভ করেছেন। Subsistence ও Capitalist হচ্ছে এ দুটি সেকটর। প্রথমটিতে ছদ্মবেকারত্বের প্রভাব আছে। তার কারণ পুঁজি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় শ্রমের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ যোগান। অপরদিকের সেকটরটি হচ্ছে উন্নত পুঁজিবাদী শিল্পসমূহ নিয়ে গঠিত। (বৈদ্যুতিক শক্তি, খনি, plantation প্রভৃতি)। পুঁজি এবং নব নব ধারণা সমূহ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমানভাবে ছড়িয়ে নেই, বরং তারা সন্নিবিষ্ট আছে কতকগুলি বিন্দুতে। সেকটরগুলি পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটিতে মজুরীর পরিমাণ কম থাকে বলে শ্রম দ্বিতীয় সেকটরে চলে আসছে। দ্বিতীয়টিতে মজুরীর পরিমাণ নির্ধারিত হয়, তার ভাষায় "By what people can earn outside that sector." উৎপাদন চলতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটে থাকে। যা মুনাফা অর্জিত হয় তা পুনর্নিয়োজিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমতাবস্থায় ঘটে—চাহিদা, দাম ও মুনাফার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার জন্য। তবে দীর্ঘকালে বিষয়টি সমাপ্তির পথে আসে। প্রথম সেকটর থেকে শ্রম বয়ে যাবার শেষ পর্যায় পৌঁছয়। ফলত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দুটি সেকটরেই সমান হয়ে আসে। এভাবে যেটা সংঘটিত হল, লুইস দেখাচ্ছেন, তা হলো শিল্পের উন্নতি এবং increased capital formation. প্রথম সেকটর তার সমস্যাসংকুল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে যেহেতু ছদ্মবেকারত্ব, নিম্নমজুরী প্রভৃতি সমস্যাগুলি দীর্ঘকালে অপসৃত হয়। শ্রমের যথাযথ ব্যবহারে যা সংঘটিত হল তা হল সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ★





Shilpi SG-2A/78 Ben

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদা ! রানীপালের সাদা ' সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সুতী, সিন্থেটিক আর ব্লেণ্ডেড-রানীপাল ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই ।

নিয়মিত রানীপাল লাগান…আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান

সুতার কাপড়ের জন্য **রানীপাল ®**

সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়ের জন্য **রানীপাল ®-এস**



কলকাতার চিড়িয়াখানা কি আকর্ষণ হারাচ্ছে?

শ্যামল রায়চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ সিংহ

দৃশ্য এক : ভোরে চিড়িয়াখানা ঢুকেই মাঝ বয়সী ভদ্রলোক সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে পরম সুখে হাঁটতে লাগলেন। পাখির খাঁচা, বাঘের গুহা কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছুক্ষণ চক্কর দিয়ে সামান্য জিরিয়ে উনি বাইরে চলে গেলেন।

দৃশ্য দুই : দুপুরে একজোড়া সুবেশ তরুণ তরুণী গেটে টিকিট কেটে ধীর পায়ে গিয়ে বসলেন গাছের ছায়ায়। নিরিবিলিতে বিভোর হয়ে রইলেন দু'জনে। কিচিরমিচির শব্দও তাদের কথায় ছন্দপতন ঘটায় না।

দৃশ্য তিন : বিকালে পড়ন্ত রোদের আলোয় ঝিলের ধারে বাঁধানো বেনচিতে শুয়ে একজন। অঘোর নিদ্রা। হাঁসের রূপ কিংবা যাযাবর পাখিদের সৌন্দর্য তার চোখ খোলা রাখতে পারেনি।

তাহলে চিড়িয়াখানা কি নিছক প্রাতঃভ্রমণ, নিভৃত আলাপ আর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গা হয়ে উঠেছে? এর আসল আকর্ষণ নেই?

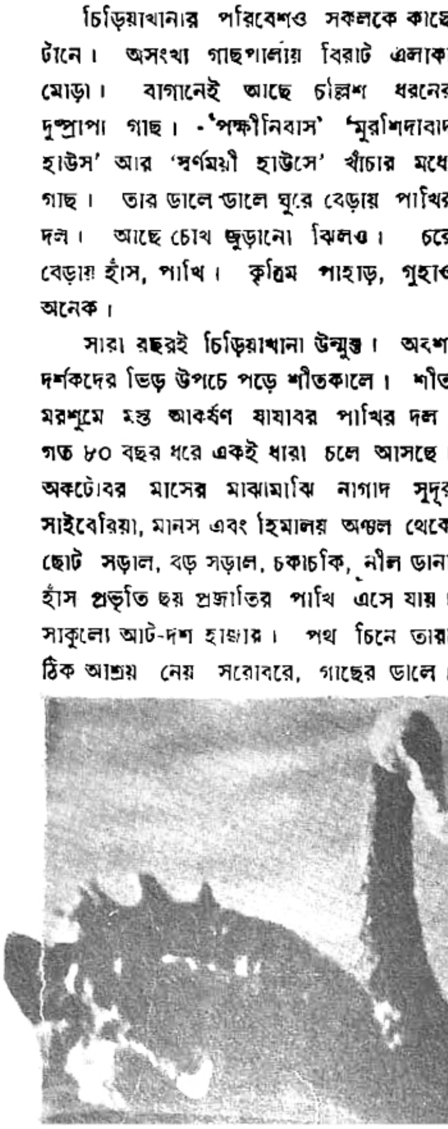
শতাধিক বছর ধরে কলকাতার চিড়িয়াখানা লাখ লাখ মানুষকে টেনেছে। এসেছেন বৃদ্ধ, শিশু, যুবা এমন কি গিন্নিরাও। সর্ব ধর্মের সর্বশ্রেণীর মানুষই জড়ো হয়েছেন এখানে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব ভারতের এরকম সম্মিলিত প্যারিবারিক আকর্ষণের স্থান আর দ্বিতীয়টি নেই।

সারা দেশে চিড়িয়াখানার সংখ্যা বর্তমানে ৪৭। এর মধ্যে ইনডিয়ান বোরড অব ওয়াইলড লাইফ স্বীকৃত ২৬। তবে খোদ মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে ৪৭ একর জুড়ে এরকমভাবে কোনটিই গড়ে উঠেনি। প্রাণী সংগ্রহের দিক থেকেও কলকাতা বর্তমানে সবার উপরে। এখানে পশু ও পাখির সংখ্যা ২,১০০'র বেশি। শুধু পাখিই আছে ২৪৫ প্রজাতির, সংখ্যায় প্রায় ১৭০০। জন্তু আছে ৩০০। সরীসৃপ ১০০। প্রাণী জগতের এরকম বিপুল এবং বৈচিত্র্যময় সমাহার ভারতে আর কোন চিড়িয়াখানায় নেই।

এখানে প্রাণী খাঁচায় থাকে। রয়েছে মুক্ত পরিবেশেও। বিশেষ সময়ে বেড়াতে আসা হাজার হাজার পাখির দলতো আছেই। বস্তুত এত রকমের প্রাণীকে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা বিস্ময়কর। আর এই কাণ্ড উপভোগ করতেই ছুটে আসেন মানুষজন—বার বার।

চিড়িয়াখানার পরিবেশও সকলকে কাছে টানে। অসংখ্য গাছপালায় বিরাট এলাকা মোড়া। বাগানেই আছে চল্লিশ ধরনের দুষ্প্রাপ্য গাছ। 'পক্ষীনিবাস' 'মুরশিদাবাদ হাউস' আর 'স্বর্ণময়ী হাউসে' খাঁচার মধ্যে গাছ। তার ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায় পাখির দল। আছে চোখ জুড়ানো ঝিলও। চরে বেড়ায় হাঁস, পাখি। কৃত্রিম পাহাড়, গুহাও অনেক।

সারা বছরই চিড়িয়াখানা উন্মুক্ত। অবশ্য দর্শকদের ভিড় উপচে পড়ে শীতকালে। শীত মরশুমে মস্ত আকর্ষণ যাযাবর পাখির দল। গত ৮০ বছর ধরে একই ধারা চলে আসছে। অকটোবর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ সুদূর সাইবেরিয়া, মানস এবং হিমালয় অঞ্চল থেকে ছোট সড়াল, বড় সড়াল, চকাচকি, নীল ডানা হাঁস প্রভৃতি ছয় প্রজাতির পাখি এসে যায়। সাকুল্যে আট-দশ হাজার। পথ চিনে তারা ঠিক আশ্রয় নেয় সরোবরে, গাছের ডালে।



ওরা বিদায় নেয় এপ্রিলে।

কিন্তু এই দুর্লভ আকর্ষণ হারানোর আশংকা দেখা দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ঘুড়ি এবং বঁড়শির সাহায্যে অতিথি পাখিদের মাঝ পথে অনেকে ধরছে। দ্বিতীয় হুগলি সেতু নির্মিত হলে তাদের পথ রুদ্ধ হবে। এমনিতেই চিড়িয়াখানার অন্য সবদিক বহুতল বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। কাছে পিঠে বাড়ি ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শব্দও বাড়ছে। পাখিরা শান্তিতে থাকতে পারবে না। কলকারখানা এবং যানবাহন আবহাওয়া দূষিত করছে। এর দাপট বাড়লে যাযাবর পাখিরা আর হয়ত আসবে না। চিড়িয়াখানার বর্তমান অধিকর্তা ডাঃ অমরেন্দ্র নাথ গুহেরও তাই ধারণা। তার মতে, ঐসব পাখি নানা কারণে জায়গা বদল করে। এর মধ্যে পরিবেশ পরিবর্তন, খাদ্যের অভাব অন্যতম। খুব ঠাণ্ডা বা গরম এরা সহ্য করতে পারে না। অপছন্দ কোলাহলও।

সংগ্রহের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্যের জন্যই দেশ বিদেশের দর্শক এ চিড়িয়াখানায় ভিড় করেন। এখানে সংগ্রহ মাধ্যম প্রধানত তিনটি : উপহার, বিনিময় ও ক্রয়। দু'দশক আগেও রাজা-মহারাজ এবং শিকারীদের কাছ থেকে বছরে অন্তত সত্তর-আশীটি নতুন প্রাণী পাওয়া যেত। ষাটের দশকেও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী একজোড়া বাঘ উপহার দিয়েছিলেন। বর্তমানে তা একরকম বন্ধ হতে চলেছে। বিনিময় ভিত্তিতে এখান থেকে বিদেশে গিয়েছে হাতি পাখি, বাঁদর। এসেছে সাদা ভাল্লুক, লামা, বর্মী বাঘ, ম্যানড্রিল, সীল মাছ ও পাখি। গত দু'বছরে একটিও বিনিময় হয়নি। যৎসামান্য কেনা হয়েছে। যেমন, জাপান থেকে পাখি।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিধিনিষেধে পশু পাখি আমদানিতে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। চিড়িয়াখানার অধিকর্তাও স্বীকার করলেন : পশু পাখির সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর না দিলে

অদূর ভবিষ্যতে এখানকার আকর্ষণ ক্ষুন্ন হবে।

ডাঃ গুহের বক্তব্য, ভারতে বন্য প্রাণীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। প্রতি পঞ্চাশ বছরে একটি করে প্রাণী-প্রজাতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ অরণ্য এলাকার সংকোচন। বন্য প্রাণীর প্রয়োজনের বদলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনাঞ্চল গড়া হচ্ছে। বনাঞ্চলের কাছে পিঠে বসতি থাবা বাড়ানোয় বন্য প্রাণী ও গৃহপালিত পশু এখন কাছাকাছি। ফলে গৃহপালিত পশুর রোগ সংক্রমিত হচ্ছে। বনাঞ্চলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য না থাকায় প্রাণীর জন্ম হারও কমে যাচ্ছে।

লনডনে মূল চিড়িয়াখানা 'সিটি জু'। হিনটার ল্যানডে প্রাণী প্রজননের জন্য রয়েছে পরিপূরক চিড়িয়াখানা। কলকাতায় 'ডিসপ্লে জু'তেই সব। কাছে পিঠে কোন সহায়ক চিড়িয়াখানা নেই। অবশ্য রাজ্য সরকার এ নিয়ে ভাবছেন। লবণ হ্রদে 'প্রজনন চিড়িয়াখানা' গড়ার পরিকল্পনা বিবেচনাধীন।

অপ্রতুল সংগ্রহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প প্রজনন। কলকাতার চিড়িয়াখানায় প্রাণী প্রজননের যেটুকু অবকাশ আছে তার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। মণিপুরের নাচুনে হরিণের সংখ্যা সারা বিশ্বে এখন মাত্র সত্তর-আশীটি। এদের বংশ বৃদ্ধি



বৃহস্পতিবার ছিল জেনানা ডে

বিশেষ প্রতিনিধি

রাজকীয় শোভাযাত্রা করে সম্রাট সপ্তম এডোয়ারড চিড়িয়াখানায় এলেন। প্রিনস অব ওয়েলস হিসবেই তখন তিনি পরিচিত। তাকে স্বাগত জানাতে ব্রীজের মুখে অপেক্ষায় ছিলেন চিড়িয়াখানার প্রেসিডেনট লরড উলিক ব্রাউন। প্রিনসের গাড়ি থামতেই বঙ্গ প্রদেশের রাজা মহারাজরা সম্ভ্রমভরে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রিনস কলকাতা চিড়িয়াখানার উদ্বোধন করতে পশ্চিমে খিদিরপুর গেট দিয়ে পায়ে হেঁটে ভেতরে ঢুকলেন। লুইস সওয়েনডলার তাকে দেখালেন: হরিণ, পাখি। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে প্রিনস দক্ষিণ পূর্ব গেট দিয়ে চলে গেলেন। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটির সময় বিকাল। ২৭ ডিসেমবর ১৮৭৫।

তবে এ চিড়িয়াখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় চারদিন বাদে, ১ জানুয়ারি। আর সাধারণ দর্শকদের জন্য চিড়িয়াখানা উন্মুক্ত হতে আরো চার মাস লেগে যায়।

মহানগরী কলকাতার বুকে শতাধিক বছরের এই আকর্ষণ কেন্দ্রের জন্য ভাবনা শুরু হয় ১৮৬৭ সালে। সে বছর জানুয়ারি মাসে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সভাপতি ডঃ জে ফেরার প্রকাশ্যে প্রস্তাব তোলেন। তিনি বলেন: 'আই হ্যাভ দ্য গ্রাটিফিকেশন অব রেকরডিং দি ইনিসিয়েশন অব এ মুভমেনট এ্যামং সেভারেল মেমবারস অব দ্য সোসাইটি এ্যানড আদারস, ফর এসটাবলিশিং দি মোসট ইউজফুল এ্যানড ইনসট্রাকটিভ অব অল প্লেসেস অব পাবলিক রিক্রিয়েশন, এ জুয়লজিক্যাল গারডেন।'

লুইস সাহেবের চাকরি 'তার' বিভাগে। তিনি সোসাইটির এক উৎসাহী সদস্য। একেই জুলজিক্যাল গারডেন স্থাপনের বিশদ পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি রিপোরট দেন। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং এগ্রি-হরটি কালচারাল সোসাইটির বিভিন্ন সাব কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনার পর তার সুপারিশ সর্ব-সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

চিড়িয়াখানা নির্মাণ পরিকল্পনায় লুইস সাহেব চারটি মূল উদ্দেশ্যের উল্লেখ করেন: ১) সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য আনন্দের ব্যবস্থা। ২) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রাণী জগতকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ। ৩) প্রাণীর বংশ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান এবং ৪) প্রাণী আমদানি রফতানি ও বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাণীতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রসার।

আলিপুরে বেলভেডিয়ার যাবার পথে টালির নালার পাশে বিরাট অঞ্চলই চিড়িয়াখানার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়। বঙ্গ প্রদেশের সরকার ৩৩ একর জমি মঞ্জুর করেন। বঙ্গের লেঃ গর্ভনর টেমপল সাহেব নিজেও উৎসাহী ছিলেন। তার নির্দেশে ১৮৭৫ সালের ২৪ সেপটেমবর সরকারী খাতায় চিড়িয়াখানা স্থাপন নথিভুক্ত হয়।

সে সময় মোট খরচ ধরা হয় তিন লাখ টাকা। সরকার পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। প্রথম কাজ শুরু হয় বেলভেডিয়ার রোডের পশ্চিম দিকে। অস্থায়ী খাঁচা তৈরি হলে সোয়েনডলার সাহেব তার নিজস্ব সংগ্রহের কিছু দুষ্প্রাপ্য প্রাণী দেন। ডিসেমবর মাসের মধ্যে নানাজনের উপহারে সংখ্যা বাড়ে। এদেশের রাজা-মহারাজাদের মধ্যে যারা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, বর্ধমানের মহারাজ, রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, ময়মনসিংহের রাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, ঢাকার নবাব আবদুল গনি, কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময়ী, কুচবিহারের মহারাজ প্রমুখ। এমনকি প্রিনস অব ওয়েলস চিড়িয়াখানা ঘুরে যাবার পর আগ্রহের নিদর্শন হিসাবে দুটি বাচ্চা হাতি ও একটি চিতাবাঘ পাঠান। নিজে চিড়িয়াখানার প্যাট্রন হন।

পশুপাখিদের আস্তানা গড়ার নকসা করেন লুইস সাহেব। কাজের তদারকীর ভার নেন ওয়াটসন সাহেব। চিড়িয়াখানা রক্ষণাবেক্ষণে সহকারীর ভার পান এক বাঙালী, রামব্রহ্ম সান্যাল। রেসিডেনস ডিরেকটার হন জে সি পারকার। প্রাণীদের দেখভালের জন্য হেড কীপারের দায়িত্ব দেওয়া হয় জহুকে। চিড়িয়াখানার মাসিক খরচ দাঁড়ায় ৩০১ টাকা।

১৮৭৫ সালেই চিড়িয়াখানা পরিচালনার জন্য কমিটি গড়া হয়। এর পাঁচজন সদস্য প্রথম থেকে সরকারই মনোনীত করতেন। ১৯৩৯-৪০ সালে ঐ সংখ্যা বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় ৩৭। এসময় পুরানো সংবিধান বাতিল করে ১৯৪০ সালের ৪ জুলাই নয়া সরকারী নির্দেশ বের হয়। সদস্য সংখ্যা করা হয় ৩৪। পরে ১৯৫৭ সালে সংশোধন করে সরকার কমিটির সদস্য সংখ্যা বেঁধে দেন ২২ জনে।

বারাকপুর লাটবাগানে বহু আগে থেকেই কিছু প্রাণী খাঁচায় রাখা ছিল। সেগুলি চিড়িয়াখানার আনা হয়। এর অন্যতম ছিল এলিফেনটাইন টরটয়েস। চিড়িয়াখানার প্রাচীনতম বাসিন্দা হিসাবে এ এখনও দর্শকদের আগ্রহের ধন।

চিড়িয়াখানার উন্নয়নে ১৮৭৬ সালের মারচ মাসে মহানগরীর বাসিন্দারা দুলাখ টাকা চাঁদা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। পুরসভাও সাহায্যের হাত বাড়ান। বহু কর ছাড় ঘোষণা করেন। রাজা মহারাজারাও এগিয়ে আসেন। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকই প্রথম ভারতীয় দাতা। পরে ধনী দাতাদের নামে চিড়িয়াখানার পশু পাখিদের জন্য আস্তানা গড়ে তোলা হয়। যেমন: মুরশিদাবাদ হাউস, স্বর্ণময়ী হাউস,



বন্ধ হবার মুখে। এখানে বিশেষ প্রয়াসে কুড়িটি নাচুনে হরিণ জন্মেছে।

কলকাতার চিড়িয়াখানায় মস্ত আকর্ষণ সাদা বাঘ। পৃথক দর্শনী গুণে দেখতে হয়। এনক্লোজার আলাদা। ১৯৬৩ সালের আগসটে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া থেকে দুটি সাদা বাঘ আসে। পরে তাদের বোনকেও আনা হয়। তদানীন্তন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু এদের নাম দেন হিমাদ্রী, নীলাদ্রী ও মালিনী। এখন মালিনী বেঁচে আছে। রয়েছে তাদেরই বংশধর —চাঁদনী, অরুণ, বরুণ, তারা, হীরা ও হিমাদ্রী জুনিয়ার। সকলেই সাদা। এ বংশে ডোরা কাটা সন্তানও হয়েছে। যেমন রবি, শশী।

সাদা বাঘ নিয়ে যাবতীয় গবেষণা এই আলিপুরেই। বিশ্বে প্রথম সাদা বাঘের বংশ ধারায় নতুন রক্তের আমদানি করা হয়েছে। বার্মিজ বাঘের সঙ্গে সাদা বাঘিনী চাঁদনীর মিলন ঘটিয়ে জন্ম নিয়েছে 'শক্তি'। এই 'শক্তি' আপাতদৃষ্টিতে অন্য বাঘের মতো দেখতে হলেও প্রকৃতিতে অনেক বেশী শক্তিশালী।

সাম্প্রতিককালে, চিড়িয়াখানায় সাড়া জাগিয়ে রেখেছে 'টাইগন'। চলতি বাঙলা নাম 'বাংহ'। ১৯৭২ সালের অকটোবরে সুন্দরবনের বাঘ 'মুন্না'র সঙ্গে আফ্রিকান সিংহী

বর্ধমান হাউস, ঝিন্দ হাউস, আবদুল গনি হাউস, মল্লিক হাউস, বাকল্যানড হাউস, এজরা হাউস, ডুমরাও হাউস। গার্বাব হাউস তৈরি হয় কলকাতাবাসী এক ইহুদির অর্থে।

১৯১৬ সালে চিড়িয়াখানার এলাকা সম্প্রসারিত হয় আরো দক্ষিণে। বঙ্গ প্রদেশের সরকার তদানীন্তন ডুয়েল এভেনিউ এবং আবহাওয়া দফতরের কিছু এলাকা চিড়িয়াখানাকে দিয়ে দেন। প্রশস্ত পরিসরে আধুনিক ঢঙে বিভিন্ন প্রাণীর এনক্লোজার গড়ে ওঠে। পাখি ও অন্যান্য কয়েকটি প্রাণীর আবাস তৈরি হয় এরও আগে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৬ সালের ফেবরুয়ারি থেকেই জংলী মুরগী ও পাখিরা প্রসব করতে শুরু করে।

চিড়িয়াখানা চালুর প্রথম পর্বে বৃহস্পতিবার কোন বাইরের পুরুষ চিড়িয়াখানায় ঢুকতে পেতেন না। এদিন ছিল 'জেনানা ডে'। মাথাপিছু আট আনা গুনে কেবল মহিলারাই যেতেন। বুধবার নির্দিস্ট ছিল কর্মকর্তাদের জন্য। সাধারণ দর্শকদের জন্য প্রবেশ পথে গেট ছিল। দর্শনীর বহর দিন অনুযায়ী। যেমন সোমবার: আধ আনা, মঙ্গলবার: এক আনা, শুক্রবার দু আনা, শনি ও রবিবার চার আনা। ১৯০২ সালে ঠিক হয়, রবিবার বাদে সপ্তাহের অন্যান্য দিনে মাথাপিছু এক আনা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। শুধু রবিবার সূর্যোদয় থেকে বেলা দুটো অবধি চার আনা এবং দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটাকা।

চিড়িয়াখানার বর্ধিত খরচ খরচার দিকে তাকিয়ে কর্তৃপক্ষ পরে বহুবার দর্শনীর হার পরিবর্তন করেন। স্বাধীনতার পর প্রবেশ মূল্য হয় এইরকম: মাথাপিছু এক আনা থেকে দুআনা (১/৬/১৯৪৮)। পঁচিশ পয়সা থেকে পঁয়ত্রিশ পয়সা (১/৭/১৯৬০)। পঁয়ত্রিশ পয়সা থেকে পঞ্চাশ পয়সা (২২/৪/১৯৬৮)।

প্রদর্শিত প্রাণীর সংখ্যা নানাকারণে মাঝে মাঝে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও দর্শকের সংখ্যা কিন্তু কমেনি। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫-১৯১৫ দশ বছরে দর্শকদের ভিড়কে তদানীন্তন ম্যানেজিং কমিটি 'রেকরড এ্যাজ এ রিমারকেবল ফিট' বলে উল্লেখ করেন। তাদের অনুমান, ১৯০৫ সালে অস্থায়ী বঙ্গ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আগমন বাড়ে। পরে ১৯৪৫-৫৫ দশকেও ভিড় উপচে পড়ে। ১৯৬৫ সালের ২৫ ডিসেমবর এক দিনেই দর্শক আসেন ১৯,১০৭ জন। বাংলা ভাগের পর দর্শকদের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়।

১৮৯২ সালে কালীঘাট থেকে চিড়িয়াখানা পর্যন্ত সরাসরি পথ খোলা হয়। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, কালীঘাটে যে সব মানুষ মন্দিরে পূজা এবং গঙ্গাস্নান করতে জড়ো হন তারাও যেন চিড়িয়াখানা ভ্রমণ করে আসেন। প্রয়াস বৃথা যায়নি। রেকরডে আছে, ১৯০৭ সালে অর্ধোদয় যোগের সময় মাত্র কয়েক দিনেই ৫০ হাজার পুণ্যার্থী চিড়িয়াখানা ঘুরতে যান। স্বামী বিবেকানন্দও এখানে এসেছিলেন।

প্রাণী জগত নিয়ে চিড়িয়াখানায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হয় ১৮৯২ সালে। ওই সময় বাবু জয়গোবিন্দ ল ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়। সাপে কামড়ানো মানুষকে বাঁচানোর জন্য পথ বের করার উদ্যম চলে। এখানেই ডাঃ ডি ডি কানিংহাম তাঁর প্রখ্যাত পরীক্ষা করেছিলেন।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় পশু প্রজননের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ১৮৮০ সালে। সুন্দরবন থেকে একজোড়া নরখাদক বাঘ খাঁচায় ভরা হয় ১৮৭৮ সালে। বাঘিনী গ্রীষ্মকালে তিনটি বাচ্চা প্রসব করে।

১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে চিড়িয়াখানায় অঘটন ঘটে। সন্ধ্যা নাগাদ দুটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার অসর্তকতার সুযোগে বর্ধমান হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ে। জানাজানি হতে হতে চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে পুলিশ ও জওয়ানদের সাহায্য চান। সারারাত চিড়িয়াখানা করডন করে রাখা হয়। পরদিন ভোরের আলোয় তাদের দেখা যায়, গণ্ডারের খাঁচায়। কোন উপায় না দেখে পুলিশ কমিশনার গুলি করে বাঘ দুটিকে মেরে ফেলেন। কলকাতায় ব্যাঘ্রহত্যার ঘটনা এই প্রথম।

জাতে ভারতীয় এক পুরুষ গণ্ডার হঠাৎ মারা যায় ১৯৩০ সালের মে মাসে। ময়না তদন্তে দেখা যায়, পেটে আরসেনিক। আর এক মৃত্যু চিড়িয়াখানার ইতিহাসে কালো হয়ে আছে। ১৯৩৯ সাল, ২৪ এপ্রিল। এদেশীয় এক তরুণী অতিরিক্ত আগ্রহে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে জলহস্তীর এনক্লোজারের বেড়ার উপর চড়ে ঝুঁকে পড়ে। টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ ভেতরে পড়ে যায়। পুরুষ জলহস্তী তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলে।

বাইরের এক ব্যক্তি সাদা হাতি নিয়ে চিড়িয়াখানায় আসেন। ১৯২৮ সালের জুন মাসের ঘটনা। কর্তৃপক্ষ তাকে জায়গা দেন। 'জীবন্ত দেবতা' জ্ঞান করে নিত্যদিন হাজার হাজার দর্শক ভিড় করতেন। কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যে হাতি মারা যায়।

চিড়িয়াখানার দুই হাতি বেগম আর জয়মালাকে পাঠানো হয় বেলভেডিয়ার শিশু উৎসবে। দিনটি ১৯৩৯ সালের ২৮ ডিসেমবর। ভাইসরয় স্বয়ং উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন। হাতি দুটি তূরীবাদকদের বহন করে নিয়ে যায়।

এতসব মহাকাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে কলকাতার চিড়িয়াখানা দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অধিকাংশ বড় বড় প্রাণী বিশেষ করে মাংসাশী জন্তু অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেরেও ফেলা হয় কিছু। চিড়িয়াখানায় সামরিক ছাউনি পড়ে। বাঘের গর্জনের বদলে শোনা যায় বন্দুকের শব্দ। আগের রূপে চিড়িয়াখানা পরে ফিরে আসে বটে, কিন্তু আরো কয়েক বছর সময় লেগে যায়। ★

কৃতজ্ঞতা: বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।



'মুন্নি'র মিলনে জন্ম নেয় নতুন স্ত্রী প্রাণী 'টাইগন'। দুনিয়ার আর কোথাও এরকম প্রাণী জীবিত নেই। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় এর নামকরণ করেন 'রুদ্রাণী'। ১৯৭৪ সালের মারচে মুন্না আর মুন্নী আবার কন্যা প্রসব করে। এর নাম হয় 'রঙ্গিনী'। কিছুদিন পরে মুন্না মারা যায়।

চিড়িয়াখানার প্রজনন সংক্রান্ত ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, চীন দেশীয় ময়ূর জাতীয় রূপালী পাখির সন্তান উৎপাদন। শামুক খোল পাখিও জন্মেছে। যৌন জড়তা ছিল এমন একটি গণ্ডারকে হরমোন ইনজেকশন দিয়ে সন্তান উৎপাদনক্ষমও করা হয়েছে। বন্দী অবস্থায় গণ্ডারের বাচ্চা হবার ঘটনা বিরল। এছাড়া গত বছরেই প্রথম সোনাজঙ্ঘা পাখির শাবক হয়েছে। চিড়িয়াখানার শতাধিক বছরের ইতিহাসে এর নজির মেলে না।

প্রকৃতপক্ষে গভীর অরণ্যে প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশেও যা সম্ভব হচ্ছে না বন্দী জীবনে নতুন প্রাণের স্পন্দন বন্য প্রাণী প্রেমিককে নিশ্চয় আনন্দ এনে দেবে। তার চেয়ে বড়ো কথা, অনেক দুর্লভ প্রাণী হারিয়ে যেতে যেতে হয়তো থেকে যাবে এই চিড়িয়াখানাতেই।

প্রজনন ছাড়াও হঠাৎ জন্ম চিড়িয়াখানায় প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ১৯৬১ সালের জুন মাসের ঘটনা। আসামের কাজিরাঙা বন থেকে টোকিয়ো চিড়িয়াখানা যাবার পথে বিশ্রামের জন্য এক স্ত্রী গণ্ডারকে আলিপুরে রাখা হয়। চারদিনের মাথায় সে সন্তান প্রসব করে। দু'হপ্তা পরে মা বিদেশে পাড়ি দেয়। শিশু গণ্ডার এখানে রয়ে যায়। এই 'স্নেহ' সকলেরই স্নেহের পাত্রী।

আর এক কাণ্ড ঘটে ৭৮ সালে। অরণ্যে বাড়াবাড়ি করার জন্য সুন্দরবনের এক বাঘকে ঘুম পাড়ানী বন্দুকের সাহায্যে ধরা হয়। বনে বেড়ে উঠা এই বাঘ 'সুন্দরলাল' নতুন জীবন মেনে নিয়ে এখন দর্শকদের আগ্রহের খোরাক।

চিড়িয়াখানা হারিয়েছেও অনেক। এখানকার এক আকর্ষণ ছিল হাতির পিঠে চড়া। এখন বন্ধ। এর পিছনে আছে এক বিয়োগান্ত ইতিহাস। আগস্ট মাস, ১৯৬৩ সাল। এক সন্ধ্যায় 'ফুলমালা' হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে মাহুত ফরমান মিঞাকে পায়ে পিষে মেরে ফেলে। ওষুধ ছিটিয়েও তাকে শান্ত করতে না পেরে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কলকাতা পুলিশের রনি মূর গুলি করে তাকে সংহার করেন। তার মৃতদেহ সরানোর জন্য পরের দু-দিন চিড়িয়াখানা বন্ধ থাকে। একসময় দর্শকরা ভিড় করতেন ভারতীয় সিংহ শয়তানের খাঁচার সামনে। ফুলমালা ঘটনার ঠিক পঞ্চাশ মাস পর সেও একভোরে তার কীপার মহম্মদ আমিরকে খতম করে দেয়।

চিড়িয়াখানায় উত্তর মেরুর ভল্লুক দেখে ছেলেবুড়ো সবাই বেশ আনন্দ পেতেন। ১৯৬২ সালে অবশিষ্ট ভল্লুকটিও মারা যায়। বছর তেত্রিশ আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাহাজাদপুর থেকে কুমীর ছানা এনে উপহার দিয়েছিলেন। চিড়াখানা এলেই বহু দর্শক এর খোঁজ করতেন। এটিও আর বেঁচে নেই।

সীল মাছও আর নেই। কোপেনহেগেন থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়েছিল। এদের জন্য গড়া হয়েছিল সুদৃশ্য পুল। মাস কয়েক আগে এ দুটি মারা যায়। পেটে মেলে নুড়ি। দর্শকরা এর মৃত্যুর কারণ বলে কর্তৃপক্ষের অনুমান। সত্যিই এক দুর্লভ সম্পদ চিড়িয়াখানা হারিয়েছে।

আফ্রিকার জিরাফ ছিল শিশুদের খুব প্রিয় প্রাণী। ডোরাকাটা লম্বা প্রাণীর ছোটাছুটি উঁকি ঝুঁকি আনন্দের খোরাক যোগাতো। বছর দশ বারো আগে শেষ জিরাফটিও মারা যায়। পরে আর জিরাফ আসেনি।

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জীবিত প্রাণী দুটি কচ্ছপের বাসস্থান এই চিড়িয়াখানায়। এদের বয়স দুশো বছর পার। এরা যখন কোনরকমে দুতিন পা হেঁটে ক্লান্ত হয়ে দীর্ঘক্ষণ বিশ্রাম নেয় তখন অবস্থা দেখে শিশুরাও হেসে



এক নজরে একশো বছর

সাল	দর্শক	দর্শনী (টাকা)	স্তন্যপায়ী জীব	পাখি	সরীসৃপ	খাদ্যের খরচ (টাকা)
১৮৭৫-১৮৮৫	১,২৫,৭৪৯	১০,৮৫৮	—	—	—	—
১৮৮৫-১৮৯৫	১,১৬,৭৪৭	৯,৫১৮	—	—	—	৯,৯১৪
১৮৯৫-১৯০৫	১,৮৫,৫২০	১৪,৩৬৯	৪৬৭	৭০৭	২২৩	১২.৩০৬
১৯০৫-১৯১৫	৫,৪৪,২৯২	৪১,১৬৫	৪৫৬	১,১৯৪	২৪৬	২০,৪৫০
১৯১৫-১৯২৫	৭.৩৬,১১০	৫৭.১১৫	২৯৯	১ ৬৮৩	১৯০	৩৮,৬৪৫
১৯২৫-১৯৩৫	৯.৯৭,২১৮	৬৭ ৬৯৫	৩৭৫	১,৮৩৬	১৪১	৪২,২২৫
১৯৩৫-১৯৪৫	৮,৯০,১৪৬	৫৫ ৬৭৪	৪০০	২.০৬৩	৭৫	৩৬,৮৩৯
১৯৪৫-১৯৫৫	১৪,৭৫.২১৮	১,৬০,০৫৩	২৯০	১,৪৬১	৫৭	৭৯,৫৫৬
১৯৫৫-১৯৬৫	১৬.৭৪.৩৯৩	৩ ৬৪,৩৩৩	৩১৯	১,৭০০	৫৯	১,৬২,৭৪৩
১৯৬৫-১৯৭৫	১৭ ১৫,২৯৫	৭,৩৭.৩১৮	৩৩১	১,৮৮৪	১১২	৩,০৬ ৯২৩

দুনিয়ার অদ্বিতীয়

সিংহ পিতা ও টাইগন মাতার সন্তান কোন প্রাণী? সারা দুনিয়ায় তো এরকম জন্মের নজীর নেই। তাই ওই অভূতপূর্ব সৃষ্টির পরিকল্পনা যাদের সেই কলকাতা চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ নাম দিয়েছেন 'লিটিগন'।

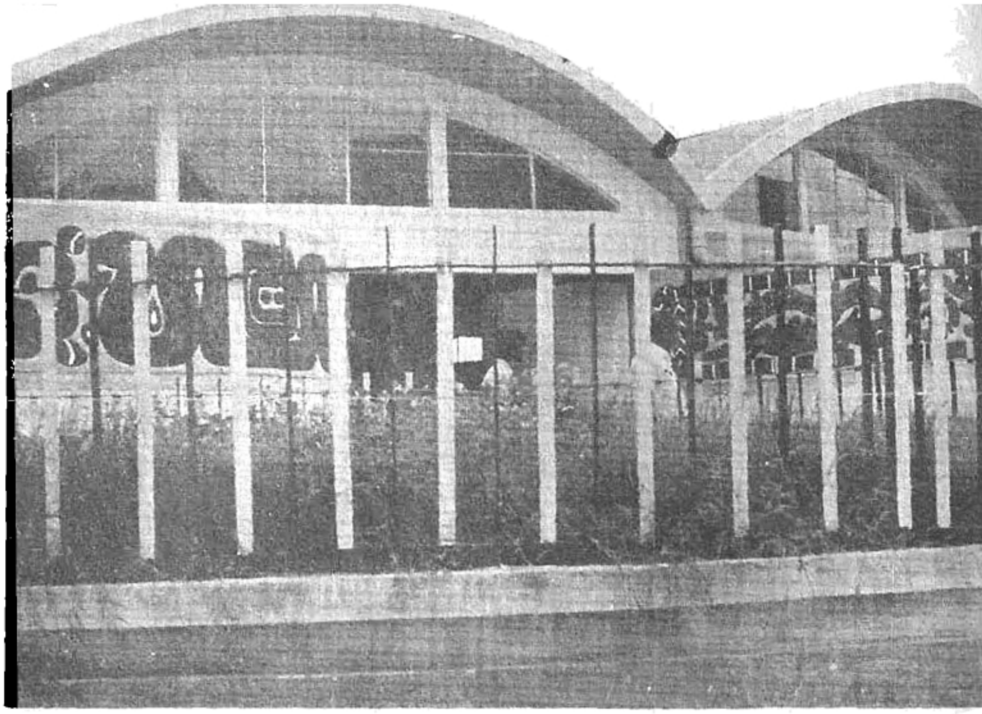
জানুয়ারিতে 'লিটিগন' দশ মাসে পা দিয়েছে। জন্মের সময় তার ওজন ছিল সাড়ে তিন কেজি। দেড় ফুট উচ্চতা। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বায় চারফুট। গায়ের রং পাঁশুটে, ডোরা দাগও আছে। অবশ্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রঙ পালটাবে। এমনকি ডোরাও মিলিয়ে যাবে। চিড়িয়াখানার বিশেষজ্ঞদের অনুমান।

লিটিগনের কানদুটি বেশ বড়, লম্বাটে ধরনের। অনেকটা গাধার কানের মতো। মায়ের দুধ ছাড়ার পর সেদ্ধ পাঁঠার মাংস চার মাস বয়স পর্যন্ত খেয়েছে। এখন খায় সেদ্ধ গরুর মাংস। সংকর জাতীয় প্রাণী বলে শক্তিও বেশি, তেজও তাই।

লিটিগনের বাবার পোশাকী নাম 'দেবব্রত'। মাকে সবাই ডাকে 'রুদ্রাণী'। বর্তমান লিটিগণ তার বাবামায়ের প্রথম সন্তান নয়। রুদ্রাণী আগে দু'বার মৃত সন্তান প্রসব করেছিল। তৃতীয়বার অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের মারচে রুদ্রাণীর তিনটি শাবক হয়। এর মধ্যে একটি মরা বাচ্চা। অপরটি মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা বাঁচে। অবশিষ্টটিই এখনকার লিটিগন।

লিটিগনের পূর্বপুরুষের জন্মলগ্নেও অভিশাপ ছিল। তার মা রুদ্রাণীর জনক-জননী সুন্দরবনের বাঘ 'মুন্না' এবং আফ্রিকার সিংহী 'মুন্নি'। তিনবার মৃত বাচ্চা প্রসব করেছিল লিটিগনের দিদিমা।

লিটিগনকে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষের অগোচরে রেখেছেন। একে সুস্থ সবল করে তুলে জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করবেন। তবে প্রতিদিন সকালে লিটিগন চিড়িয়াখানার একটি ওপেন এনক্লোজারে পদচারণা করে। সেখানে উঁকি মারাও নিষেধ।

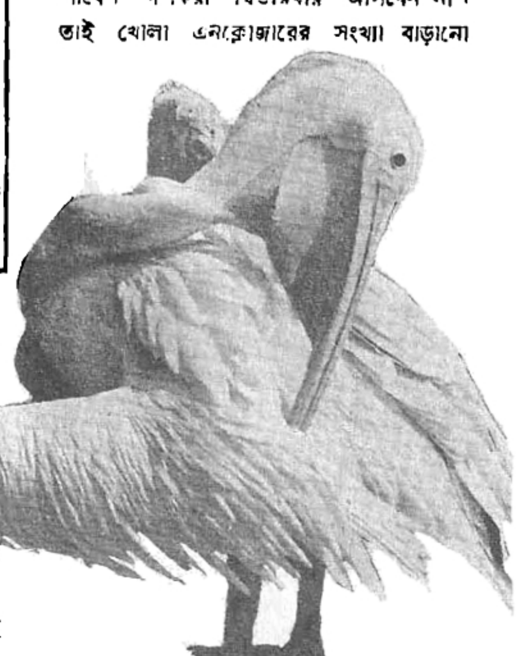


কুটিপাটি খায়। চিড়িয়াখানার জন্মলগ্নে মোট পাঁচটি কচ্ছপকে আনা হয়েছিল। তিনটি আর নেই।

স্ট্যানজে দম্পতি অসট্রেলিয়ান। এশিয়ার বহু চিড়িয়াখানা ঘুরে আসেন আলিপুরে। অনেক প্রাণী দেখে তারা চমৎকৃত। তাদের কথায়, 'যাযাবর পাখি ছাড়াও এখানে [illegible] ধরনের পাখি আছে। কিন্তু পশুরা ওভাবে খাঁচায় আটক কেন?'

এই চিড়িয়াখানায় অধিকাংশ প্রাণীই বন্দী। স্বাধীনভাবে যত্রতত্র বিচরণের অবকাশ নেই। ফলে তাদের মধ্যে প্রাণবন্ত ভাবের বড়ো অভাব। বর্তমানে আলিপুরে খোলা এনক্লোজারের সংখ্যা মাত্র বাইশটি। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, নীল গাই, চিতল, এ্যানটিলোপ, হরিণ, জলহস্তী, ময়ূর, শিম্পাঞ্জী, ক্যাঙারু, জেব্রা, গজকচ্ছপ, কুমীর আর কয়েক জাতের পাখির জন্য। বাঘ সিংহের খোলা এনক্লোজার সকলের চোখে পড়বেই। উঁচু জমিতে পাথর কেটে করা হয়েছে কৃত্রিম পাহাড়। তলায় গুহা। সেখানে একদিকে থাকে জোড়া বাঘ আর জোড়া সিংহ। সিংহ আর বাঘদের আলাদা ভাবে ছাড়া হয়। এনক্লোজারকে ঘিরে আছে পরিখা আর উঁচু প্রাচীর।

কর্তৃপক্ষও বুঝেছেন, একই প্রাণীকে একই জায়গায় দীর্ঘকাল রাখলে জীবনী শক্তি হ্রাস পাবে। দর্শকরা দ্বিতীয়বার আসবেন না। তাই খোলা এনক্লোজারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। বন বিড়াল, পুমা, জাগুয়ার, চিতাবাঘ আর ভালুকের ফারসট চানস।



কলকাতার রাজভবনের দক্ষিণে পাঁচ কিলোমিটার দূরে আলিপুর চিড়িয়াখানা। এর বুক চিরে বেরিয়ে গিয়েছে আলিপুর রোড। রাস্তার পশ্চিমদিকে চল্লিশ একরে পশু পাখিদের আবাস। পূর্বদিকে সাত একর জমিতে পশু হাসপাতাল, মাছঘর, এসব। চিড়িয়ানার প্রধান পথ আলিপুর রোড। খিদিরপুরের দিকেও একটি গেট আছে।

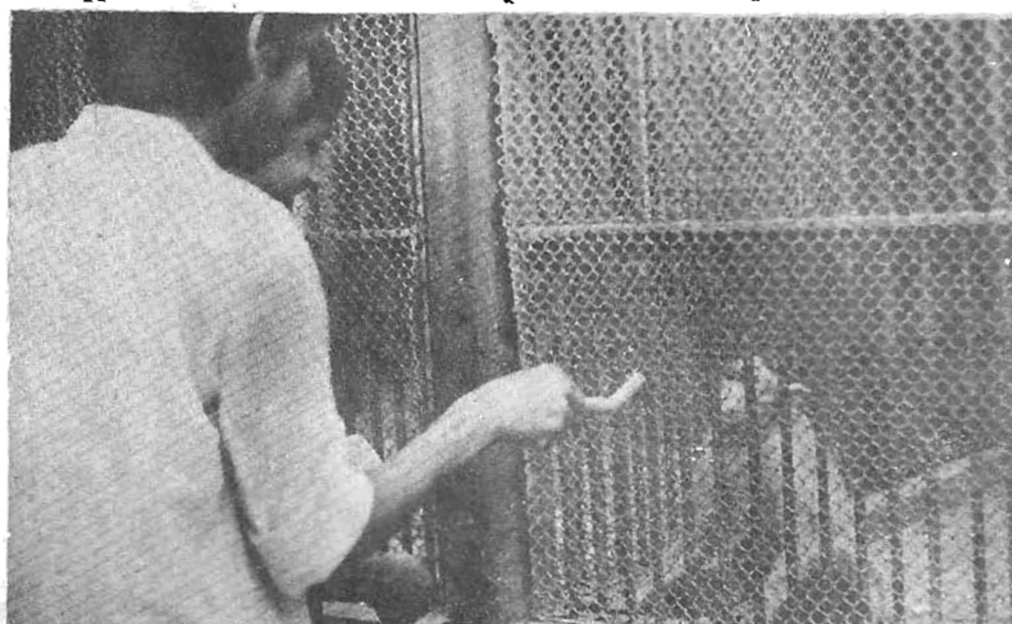
আলিপুরের চিড়িয়াখানার দর্শক সংখ্যার সিংহভাগ শিশু। ১৯৬৬ সালের অকটোবরে এদের জন্য চিড়িয়াখানার মধ্যে একটি পৃথক শিশু উদ্যান খোলা হয়। পোষা এবং শিশু জন্তু, রং চঙে পাখিতে ভরিয়ে দেওয়া হয়। এখানকার বাগান, পশু পাখির ঘর ছবির মতো। শিশুদের সঙ্গে অভিভাবকেরাও এখানে এসে হারানো ছেলেবেলায় ফিরে যান।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে গত অকটোবরে শিশু উদ্যানটিকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। বাচ্চা হাতি, গণ্ডার, ভোঁদর, সজারু, খরগোস সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতের পাখি ও মডেলের সাহায্যে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। কিছু গাছপালাকে জীবজন্তুর অবয়বে রূপান্তরিত করায় সেখানেও কৌতূহলী শিশুরা ভিড়

মোট তিন

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মোট চিড়িয়াখানার সংখ্যা তিন। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর, উত্তর কলকাতার মল্লিক প্যালেস ও দারজিলিং। মল্লিক প্যালেসের চিড়িয়াখানার মালিকানা ব্যক্তিগত। অপর দুটি সরকার নিয়ন্ত্রিত।

শিশুদের এই চিড়িয়াখানা কেমন লাগে? খড়্গপুরের সাত বছরের রবি বাগ বাবার হাত ধরে ঘুরেছে গোটা চিড়িয়াখানা। সাদা বাঘের বাচ্চা, সিংহ, ভোঁদর, ভল্লুক, তাকে আকৃষ্ট করেছে। তৃতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া রবি রুল টানা খাতায় আঁকা বাঁকা অক্ষরে কি কি দেখেছে তাও লিখে রেখেছে। শিশু হাতি রোশেনারা তাকেও শুঁড় কপালে তুলে সেলাম করেছে। হাতির পিঠে চড়তে পারেনি বলে তার বড়ো আপশোষ। শিশু উদ্যানে পশু পাখি ছাড়াও মাটির পুতুল, শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা





করছে। উদ্যানে রয়েছে স্বতন্ত্র এক গ্রন্থাগার। জীবজন্তু, প্রকৃতি সংক্রান্ত প্রাচীন তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন বইয়ের সম্ভারে তৈরি এই গ্রন্থাগারটিকে আরো সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা আছে। স্বাধীনতা দিবস, চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠা দিবস, শিশু দিবস, বন্যপ্রাণী দিবস—সব মিলিয়ে বছরে পাঁচদিন শিশু উদ্যানে ঢুকতে টিকিট লাগে না।

দেখে সেখান থেকে যেতে মন চাইছিল না। খড়্গপুরে ফিরে গিয়ে সেও বন্ধুদের এখানে আসতে বলবে।

চিড়িয়াখানায় সাম্প্রতিক আকর্ষণের মধ্যে উল্লেখ্য নতুন মাছঘর আর সরীসৃপ ভবন। বোমবের তারাপুরেওয়ালা এ্যাকোরিয়াম মতো ব্যাপক সংগ্রহ না থাকলেও বিভিন্ন জাতের রংবেরং এর মাছ এখানকার কাঁচ ঢাকা জলে খেলে বেড়ায়। মানুষ-খেকো 'পিরানহা' মাছও এখানে আছে। জুলাই মাসে পুরাতন নিবাস ছেড়ে চিড়িয়াখানার ময়াল, কেউটের দল স্থান নিয়েছে নতুন সরীসৃপ ভবনে। অর্ধগোলাকৃতি এই সাপ-ঘরের গঠন বৈশিষ্ট্য দেখেও চোখ জুড়িয়ে যায়।

কলকাতার চিড়িয়াখানার কেন্দ্রস্থলে 'ঝুকু ঝিল'। এটিও যেন এক মিনি চিড়িয়াখানা। স্থলচর, জলচর ও বৃক্ষারোহী সব রকম প্রাণীই এখানে রয়েছে। ঝিলের জলে ডানা ঝাপটায় পাখি, ডাঙায় ঘোরে খরগোস, গাছে থাকে উল্লুক।

নাই নাই করেও আলিপুর চিড়িয়াখানায় পশুপাখির আকর্ষণ এখনো কিছু আছে। তবে এর এক সমস্যা—বনময় পারবেশ তেমন নেই। অবশ্য ওড়িশার নন্দন-কানন, হায়দ্রাবাদে নেহেরু গারডেন ও গৌহাটির চিড়িয়াখানা যেমন জঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত তেমনি কলকাতার লবণ হ্রদেও সেরকম সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানার বড়ো ঘাটতি এর পরিসর। পশু পাখির তুলনায় স্থানাভাব চরম। মুক্ত বিচরণ ক্ষেত্রের জমিও নেই। তাই বর্তমানে আকর্ষণ টিকিয়ে রাখতে আলিপুর চিড়িয়াখানা শহরকেন্দ্র থেকে সরানোর কথাও উঠেছে। ★

আলোকচিত্র : সঞ্জীব বসু

খানা-পিনা

চিড়িয়াখানার প্রাণীদের খাওয়াতে নিত্য-দিন কম করেও আশী রকমের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কাক ভোর থেকে রান্না চাপে। মেনু থাকে চা, টোস্ট, চাপাটি, খিচুড়ি, পায়েস, সেদ্ধ ডিম, মাছ, এসব। গাজর, পেঁয়াজ, রসুন, আপেল, কলা, আঙুর, বেদানা, নাসপাতিও লাগে। শুধু মাংসই আসে দিনে ৩০০ কেজি। পাখিদের খাবার সময় সকাল সাতটা। কিছু পাখি দুপুরে আবার খায়। নিশাচর পাখিরা অন্ধকারের ঢল নামলে চারদিক নিস্তব্ধ হলে খুঁটে খুঁটে পেটে খাবার পোরে।

বাঘ, সিংহ লানচ সারে সকাল ন'টার ভোঁ বাজার পর। সাদা বাঘ সন্ধ্যার মুখে গুহায় ঢুকে আহার সেরে নেয়। তবে বৃহস্পতিবার সব মাংসাশী জন্তুদের উপোসী রাখা হয়।

সপ্তাহে একবারই সাপেরা খায়। শীতের চার মাস মুখে কিছু দেয় না।

পাখি ও জন্তুদের গরমকালে নানারকম ওষুধ খাওয়ানো হয়। চিড়িয়াখানা হাসপাতালের ডাক্তারদের নির্দেশে শরীরের ক্লান্তি অবসাদ দূর করতে লবণ জাতীয় পদার্থ খাবার বা জলের সঙ্গে মেশানো হয়ে থাকে। খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত ভিটামিন ও ক্রিমিনাশক ওষুধ দেওয়া হয়। কোন প্রাণী গর্ভবতী হলেই চলে স্পেশাল কেয়ার।

অনুকরণ!

বছর পনেরো আগেও চিড়িয়াখানার এক শিম্পাঞ্জী সিগারেট মুখে সুখ টান দিতো। মানুষের অনুকরণ করা ছিল তার স্বভাব। ফলে তার বিচরণ ক্ষেত্র যেন সারকাস এরিনার রূপ নেয়। একদা কিছু দর্শক তাকে উত্যক্ত করতে ঢিল ছোঁড়ে। শিম্পাঞ্জীটিও ঢিল ছুঁড়তে শিখে যায়। এতে কয়েকজন দর্শক আহত হন। নিরুপায় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ শিম্পাঞ্জীটিকে মুক্ত এনক্লোজার থেকে সরিয়ে খাঁচায় ভরে দেন। সে এখনও বন্ধ লোহার দরজার ভেতর থেকে বাইরে তাকিয়ে থাকে। দেখে, ঠিক যেমন ভাবে কোন দর্শক তার দিকে চায়।

ঘরোয়া

বর্তমান বিতর্কের প্রথম থেকেই একদল পত্রপ্রেরকের বক্তব্য হল, আজকের সাহিত্যে যাকে অবক্ষয় বলা হচ্ছে তা আসলে রিয়ালিজম। সাহিত্যের দর্পণে সমাজের দুষ্ট ব্রণ অনেকেই সহ্য করতে পারেন না, গেল গেল রব তোলেন। এদের মতে সাহিত্যের প্রকরণের মত বক্তব্যও পালটে যায়। তাকে গ্রহণ করার মত শক্তি ও উদারতা আমাদের নেই।

সত্যিই কি নেই? তাহলে এতদিন ধরে বাঙালী পাঠক নতুন নতুন সাহিত্যরীতি ও চিন্তাকে অভ্যর্থনা করলো কি করে? বাঙালী সাহিত্য-পাঠক কি হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে গেল? রিয়ালিজমের নামে দেহিক বর্ণনা, অশ্লীলতা ও কামসর্বস্বতা বাঙালী পাঠক কতটা গ্রহণ করতে পারছেন তার মূল্যায়ন দরকার।

পরিচালনা
নিকারন চক্রবর্তী

প্রার্থিত সাহিত্যলোক নেই

সার্বিক কিনা জানি না, তবে এখন যে বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ চলছে, সেটা সাহিত্যক্ষেত্রে একটু চোখ ফেরালেই বোঝা যায়। অবশ্য তার মূল্যায়ন করবে ভাবীকাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা কেটে যাওয়ার পরে বাংলা সাহিত্যে যখন তার প্রতিফলন পড়লো তখন দেখলাম মানুষের সব মূল্যবোধ-গুলোকে রাতারাতি যুদ্ধ ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে। সেই সময়টা গ্রাম উঠে এসেছিল সাহিত্যের পাতায় কিছুকালের জন্য। তারপর সেই ওলোট-পালটে যাওয়া বিধ্বস্ত মূল্যবোধ ক্রমশ জন্ম দিল alien সাহিত্যের। বাংলা সাহিত্যে alienation আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মুখোশটা ছিঁড়ে দিল। আমরা প্রত্যক্ষ করলাম কিভাবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি এবং সমাজের অন্বয়, একটা সার্বিক বিচ্ছিন্নতাবোধ ক্রমশ আমাদের গ্রাস করছে। ফলে সাহিত্যে এল বৈচিত্র্য, কিন্তু তা হয়ে উঠলো নৈর্ব্যক্তিক। সাহিত্য আমাদের positive কিছু ভাববার অবকাশ দিল না। ক্রমে ইউরোপীয় মানসিকতা অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে bureaucratic alienation-এর অনুপ্রবেশ ঘটলো। আমাদের যুবকাল এই bureaucracy থেকে লাফিয়ে নামলো sex সাহিত্যের পাতায়। আগুন ব্যবহারের অভ্যেসের মতো সত্তরের দশক ভরে উঠলো আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের সম্পর্কহীনতায়। কামুর 'আউট-সাইডার' দ্বন্দ্ব-প্রক্ষোভের ছায়া ফেললো শারদীয়া মেঘের মতো তরল বাংলা সাহিত্যে।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য মানেই আমরা শারদীয়া সাহিত্যকে বুঝি। কিন্তু কেন? এর জন্য দায়ী কারা? গুটিকয় সংবাদপত্র ঘিরে আজ যে গোষ্ঠীচক্র সুগঠিত, সংবাদ-সাহিত্যের মাথা মুণ্ডহীনতায় যারা আজ রবিবাসরীয় বা সাময়িকীর পাতা ভরান, তারাই প্রত্যক্ষত সাহিত্য-বাজারে প্রকৃত 'সাহিত্যিক'। আমাদের মানসিকতা আজ অনেকটাই বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীভূত এই শারদীয়া সাহিত্যের পাতায়। আজকের সাহিত্যে এই গতানুগতিক যুগধর্মের দোহাই দিয়ে জনরুচির নির্লজ্জ তোষণবৃত্তি। আজকের তথাকথিত 'সাহিত্যিক'রা জানেন, গল্পের কোথায়, কোন পরিচ্ছেদে, কিভাবে ও কতটুকু যৌনতা আমদানি করলে খুশী হবে পাঠক; জানা আছে কোথায় কিভাবে কতক্ষণ এক নৈর্ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতাবোধে ভুগবে নায়ক বা নায়িকা গল্পের শেষ হবে revolving প্রশ্ন-চিহ্ন বুকে দেগে। এ এক ফরমূলা—যার সলিউশন আপাতত জানা নেই আমাদের।

শারদীয়া সাহিত্যে যাদের আধিপত্য, তারা পেশায় মূলত সাংবাদিক। ফলে সাহিত্য আর সংবাদের প্রায়শই বাধে বিরোধ। কোন কোন উপন্যাস তাই 'বিশেষ সংবাদদাতার প্রতিবেদন', কোন কোন গল্প 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।' এমনটাই হয়তো অনিবার্য ছিল। কেননা যে সাংবাদিক, রাতদিন তার 'সংবাদ' নিয়ে কারবার, পুজো সংখ্যার তাগিদ এবং অর্থসংক্রান্ত চিন্তাও তার রয়েছে, সুতরাং সে-সাহিত্য যে নিছকই 'অবকাশরঞ্জনী' হবে না, এমন উচ্চাশা বৃথা। পুজোর প্রায় এক মাস আগে শারদীয়া সম্ভারগুলি প্রকাশিত হয়। ফলে বাঙালি পাঠক নতুন পোশাকের মতো কয়েকটা শারদীয়া সংখ্যারও অর্ডার দেয় তার এজেনটকে। পুজোর পর হয়তো বইগুলোর 'উচ্ছিষ্টের' দশা হয়। মোটকথা আজকের শারদীয়া সাহিত্যে সেই অনুসন্ধানী গবেষণা-চক্ষুর সন্ধান কদাচিৎ মেলে, যা একমাত্র গড়ে তুলতে পারে সৎ পাঠকের প্রার্থিত সাহিত্য-লোক।

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর

সর্বত্র নোংরামি

সাহিত্য তো জীবনের দর্পণ, কাজেই যা জীবনে ঘটছে, নিত্য যা আমরা দেখছি তাই সাহিত্যিকরা তুলে ধরছেন তাদের লেখনীতে। সাহিত্যে নোংরামী বলে যারা নাসিকা কুঞ্চন করেন তারা বলতে পারেন নোংরামী কোথায় নেই? যুগে যুগে সর্বকালে ছিল, থাকবেও চিরকাল। কোনদিনই মানুষ মালিন্যমুক্ত হবে না। হতে পারবে না। যতই কেন অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে বন্দনা করা হোক।

সাহিত্য তো জীবনমুখী, কে জোর করে বলতে পারেন, আজকের সাহিত্যে আমরা যা পাচ্ছি তা আমাদের জীবনের প্রতিফলন নয়? কতটুকু আর আমরা দেখতে পাই, দেখার পরিধি তো বিস্তৃত নয়! কিন্তু সাহিত্যিকরা নানা জগতে বিচরণশীল। তাই যা তাদের নয়ন গোচরে আসে তাই ফুটে ওঠে আধুনিক সাহিত্যে। আর আধুনিক সাহিত্য মানেই যে পুরোপুরি অবক্ষয়ের পথে তা কেমন করে বলি? তাহলে তো জীবন থেকে আমাদের সরে যেতে হয়।

বর্তমানে সাহিত্যে সেকসের বাড়াবাড়ি বলে অনেকে অভিযোগ করেন, কিন্তু সেকস কোথায় নেই? বিজ্ঞাপনে, পোসটারে, সিনেমায়, থিয়েটারে সেকসকে প্রাধান্য দিতেই হয়। তা না হলে ব্যবসা চলে না। তেমনি সাহিত্যও যদি বাস্তবকে এড়িয়ে চলে তাহলে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। লেখকের এ স্বাধীনতা থাকবেই। যা সত্য, তা যতই কটু হোক তাকে প্রকাশ করতেই হবে।

আমাদের বর্তমান সমাজটাই তো এখন ভেঙে পড়েছে। ভেঙেছে যৌথ পরিবার শান্তি শৃঙ্খলা ঘরের বন্ধন। তবে সাহিত্যের দোষটা কি? নিজেদের চেহারা আমরা সাহিত্যে দেখতে পাই। আমাদের লোভী চোখ, ঘুষের হাত মুঠো হয় না। তাই আমরা ভয় পাই। নির্ভেজাল ভাল মানুষ সাজার চেষ্টা করি। বার বার আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করেছে আমাদের সাহিত্য, সুযোগ দিয়েছে নিজেদের মুখোস খুলে ফেলতে। তবুও কি বলব, বর্তমান বাংলা সাহিত্য সার্বিক অবক্ষয়ের পথে? আমার মন একথা মানে না।

রমা গুপ্তা, হাওড়া—৩

প্রগতিশীল ট্রেড মার্ক

'বর্তমান বাংলা সাহিত্য কি সার্বিক অবক্ষয়ের পথে?'—এই বিষয়ের উপর পাঠক-বর্গের কাছে বিতর্ক আহ্বান করার ব্যাপারে পরিবর্তনের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে মহৎ। কারণ সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে এইরূপ বিতর্কের সুযোগ পাওয়া এতদিন প্রায় আশাতীত ছিল। 'পরিবর্তন' কর্তৃপক্ষকে এজন্য সাধুবাদ জানাই।

কোনো বিতর্কই বাতাসে ফোটে না, ফোটে বাস্তব সংসারে গভীর আন্দোলনের মুখে। সমাজ-জিজ্ঞাসায় যখন পুরাতন নীতি ও রীতি হয়েছে পরিত্যক্ত, সাহিত্যেও তখন নতুন চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে এবং যথারীতি বিতর্কও উপস্থিত হয়েছে।

সাহিত্য সময়ের দলিল। সময়ের ছাপ তার সর্বাঙ্গে নিশ্চিত ভাবে পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় সাহিত্যের চূড়ান্ত রূপ কি হবে? অর্থাৎ সাহিত্য সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষের উন্নতি-কল্পে রচিত হবে অথবা মুষ্টিমেয় শোষক-পুঁজিপতির স্বার্থে নিয়োজিত হবে? আমাদের মূল দ্বন্দ্ব এখানেই।

আমার মতে, সাহিত্য যেহেতু সমাজ-বহির্ভূত কোন অলৌকিক সামগ্রী নয়, সেহেতু সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐ বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থেই তাকে নিয়োজিত করতে হবে। ঐ বিশেষ শ্রেণীর দুঃখ-আনন্দ-হতাশা-বেদনা ইত্যাদিকে সঠিক বিশ্লেষণের দ্বারা উপস্থাপনা করে, এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার প্রেরণা দিতে সৃষ্টি হবে সাহিত্য।

কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার! বর্তমান কালের প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিক-ই হঠাৎ অতি মাত্রায় 'প্রগতিশীল' হয়ে পড়েছেন। সকলেই নিপীড়িত শ্রেণীর স্বার্থে সাহিত্যকে এতবেশি করে কাজে লাগাচ্ছেন যে ঐ বিশেষ শ্রেণীর 'ছেড়ে দে বাপ, কেঁদে বাঁচি' গোছের অবস্থা। এর কারণ কি?

এর কারণ "স্রষ্টার সংবেদনশীল মন এবং জীবন-অন্বেষার আকুতিতে উত্তপ্ত হৃদয় ছাড়া কোনো স্তরের মানুষেরই সঠিক বাস্তবকল্প রূপায়ণ সম্ভব নয়।" জনৈক ইংরেজ সমালোচকের মতে 'No white man however brave and well intentioned can ever sing the Negro Song. বর্তমান 'প্রগতিশীল' সাহিত্যের লেখকদের অতি আধুনিকতা ঐ সমস্ত শোষিত মানুষকে ছাড়িয়ে অতি উচ্চপর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় সাধারণ মানুষ আজ হতভম্ব। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা জনগণের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে তারা সাহিত্যে স্থান দিচ্ছেন সুউচ্চ অট্টালিকার air-conditioned ফ্ল্যাটে বসে—অভিপ্রায়, 'প্রগতিশীল' পদবী অর্জন করা। যদি সেই সাহিত্য পাঠকবর্গকে উৎসাহিত না করে তবে সাহিত্যিকদের অভিমত, তার সাহিত্যের মূলভাব অনেক উঁচুপর্যায়ের এবং বস্তুত যে ভাবের একমাত্র অধিকারী তিনি স্বয়ং। এটা এক ধরনের বুদ্ধিজীবী-সুলভ ধ্যান ধারণা।

আবার বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা আছে যা প্রগতিশীল' ট্রেড মার্ক-এ বিকোচ্ছে। 'প্রগতিশীল' কথাটি নিঃসন্দেহে সাহিত্যের ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিচ্ছে। একটি উলঙ্গ নারীর শরীরের বর্ণনা দিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হলো (অবশ্য যদি তাকে সাহিত্য বলা যায়) তার প্রচ্ছদে 'প্রগতিশীল' ট্রেড মার্ক লাগিয়ে দিলেই গড়গড় করে সেই সাহিত্য কালকে প্রগতির পথে টেনে নিয়ে যাবে?

মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ী, যারা আলু পটলের মতো সাহিত্যের লাভজনক ব্যবসা খুলেছেন এবং তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা সাহিত্য সৃষ্টি করছেন সেই সাহিত্য যে সার্বিক অবক্ষয়ের পথে যাবে তাতে সন্দেহ কি?

সুস্মিত মজুমদার, লিলুয়া

দর্পণে মুখের ব্রণ

সাহিত্য শব্দটার বিভিন্ন অর্থ করেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষেরা। মোটামুটি ধারণা যে এটা সমসাময়িক সমাজ দর্পণ। এবং যেহেতু কিছু লোক (অনেকেই) শরৎচন্দ্র পড়েন, রবীন্দ্রনাথকে interior decoration-এর কাজে লাগান এবং বঙ্কিমচন্দ্র নামটা জানেন মাত্র, তাদের কাছে সৎ সাহিত্য মানে বেশ একটা ভদ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাহিনী বিন্যাস যেখানে মানুষ পৃথিবী নামক এক অতীব সুখপ্রদ (দুঃখ থাকলেও রংচং-এ দুঃখ) সমাজে বাস করে। সেখানে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিখুঁত। আমি মনে করি এদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই সাহিত্য আজকাল অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর। কারণ খুবই সোজা, যেহেতু আজকালকার শতকরা ষাট ভাগ সাহিত্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমাজকে তো তুলে ধরেই না, উপরন্তু নায়কেরা বিকৃত মানসিকতার অধিকারী। তাই গল্পে অশ্লীলতার মাখামাখি।

আমি প্রশ্ন করি এদেরকে যারা মনে করেন আধুনিক সাহিত্য ক্রমশ অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর যে, "আমাদের সমাজ অবক্ষয়ের পথে কতখানি অগ্রসর?" সাহিত্যের সংজ্ঞাই যখন সমসাময়িক সমাজ দর্পণ তখন আধুনিক সাহিত্য প্রথাগত রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কি ভাল করেনি? আমার মনে হয়, এটাই অগ্রগতি। অবক্ষয় নয়। আজকালকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যুবকই যখন বেকার, একটা উদাসীন জীবনযাপন করে অসুখী, এবং তা ভোলার জন্য নেশা করে উদভ্রান্ত, তখন আমরা কি করে আশা করব যে সে যে কোনো গল্পকারের কলমে হয়ে দাঁড়াবে একজন ideal যুবক, পথনির্দেশক? তাই গল্পকার যখন কোনো মেয়ের প্রতি অশ্লীল দৃষ্টি নিক্ষেপকারী যুবকের কথা বর্ণনা করেন, তখন তাকে বা তার সাহিত্যকে দোষারোপ করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। গল্পকার নিমিত্ত মাত্র। সত্যি কথা বলতে কি, বাস্তবজীবনে লেখক নিজেও কোনো কোনো সময়ে সেই যুবকে রূপান্তরিত হন।

গৌতম বসু, কলকাতা-২৮



আবিদ সুতি
সুজা
১০
দেবীর অভিশাপের ভয়ে সবাই মিলে সুজাকে আক্রমণ করল
দুম
মাগো!
দড়াম
গেছিরে
সুজা নিজেকে বাঁচাতে খুব চেষ্টা করল, কিন্তু—
দুম
বাপরে
সুজা হার মানতে বাধ্য হল।
সূর্য দ্বীপের লোকেরা!
সুজা আর বিন্দুকে এক সঙ্গে বেঁধে ফেলা হল।
সুজা ইচ্ছে করে আমাদের পবিত্র কাজে বাধা দিয়েছে
এতে দেবী বামালির মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।
ওর শাস্তি হোক।
উচিত শিক্ষা দিতে হবে ওকে।
ওকে চরম শাস্তি দেওয়া হোক
মৃত্যু!
শুনে সকলেই একবাক্যে বলে উঠল—
মৃত্যু!
(ক্রমশঃ)

ভারতের যৌন-রোগীদের দশ ভাগের এক ভাগ পশ্চিমবঙ্গেই

কামাল হোসেন



যৌনরোগীদের জন্য হাতছানি

সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে—ভারতে প্রতি দশজন যৌনরোগীর মধ্যে এক-জনের বাস পশ্চিম বাংলায়। সমস্যা রীতি-মত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সরকারি হিসেব-মাফিক ১৯৭৮ সালে সারা ভারতের বিভিন্ন ভি ডি ক্লিনিকগুলিতে তিন লক্ষেরও বেশি যৌনরোগী উপস্থিত হয়েছিলেন। পশ্চিম বাংলায় আশি হাজার পুরোনো রোগী ছাড়াও আরো ৩৪.৬৯০ জন নতুন রোগী ক্লিনিকগুলিতে এসেছেন।

এ রাজ্যে মোট একুশটি ভি ডি ক্লিনিক রয়েছে। পরিসংখ্যানে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশিতও হয়েছে, সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নতুন রোগীদের মধ্যে ৯,৭৪৬ জন বিবাহিতা ও ১ ৮৬৩ জন কুমারী মেয়ে। ওদিকে বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১২,৩৫৪ এবং অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৯.০৯৪। এছাড়া বালক-বালিকা, শিশুরা আছে। কুমারী মেয়েদের মধ্যে রোগের প্রকোপ সামান্য কম হলেও বিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে বেড়েই চলেছে। ১৫ বছরের কম বয়সী বালক-বালিকাদের মধ্যেও যৌনরোগের প্রকোপ দেখা যায়। এরকম ৭৩৪ জনকে ক্লিনিকগুলিতে চিকিৎসা করা হয়েছে ১৯৭৮-এ। এদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই বেশি।

মনে রাখা দরকার, এ ধরনের হিসেব সব সময়েই অসম্পূর্ণ। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অজ্ঞানতা, লজ্জাবোধ, ভুল সংস্কার এসবের প্রভাবে বেশির ভাগ রোগীই ক্লিনিকে চিকিৎসা করাতে যান না। গোপন ব্যাধির বিষ শরীরে বহন করে সমাজকে আরো বিষাক্ত করে তুলছেন তারা।

যৌনরোগের নাম শোনা মাত্র সাধারণ মানুষ আঁতকে ওঠেন। কিছুটা ঘৃণা ও গোপনতাও লুকিয়ে থাকে এ ধরনের মানসিকতায়। আর সব সমাজেই একটা রক্ষণশীল দিক থাকে, যার প্রভাবে স্বয়ং রোগীও নিজের রোগ স্বীকার করতে লজ্জা পান, ভয় পান। কিন্তু ক্রমবর্ধমান যৌন-রোগের প্রেক্ষাপটে এ সম্বন্ধে লুকোচুরি কানামাছি খেলার দিন অতীত হয়ে গেছে। এ রোগ শুধু জীবাণুর সঙ্গেই নয়, আরো গভীরে সামাজিক, আর্থনীতিক ও মানসিক জটিলতার সঙ্গে জড়িত। এ প্রসঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ করার দিন এসেছে। এ রাজ্যে যৌনরোগ কেন মারাত্মক-ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান। যৌনরোগ কী, কেন কীভাবে সম্প্রসারিত হয়।

গ্রীক প্রেমের দেবী ভেনাসের নাম থেকে ভেনেরিয়াল ডিজিজ। আধুনিকালে এ সব রোগকে সেকসুয়ালি ট্র্যানসমিটেড ডিজিজেস বা সংক্ষেপে এস টি ডি নামে চিহ্নিত করা হয়। পুরুষ ও নারীর আদিম ক্রীড়ায় ভেনেরিয়াল, নন-ভেনেরিয়াল দু'রকম রোগই হতে পারে। নন-ভেনেরিয়ালকে ঠিক সরাসরি যৌনরোগের তালিকায় রাখা হয় না।

প্রধান যৌনরোগগুলির নাম ইদানিংকালে কারোর অজানা নয়—সিফিলিস, গনোরিয়া, নন-স্পেসিফিক ইউরেথ্রাইটিস, স্যানক্রয়েড বা সফট সোর, লিমফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়াম, গ্রানুলোমা ইনগুইনালি। এছাড়া সংক্রমণের দিক থেকে এদের থেকে কম-শক্তিসম্পন্ন ও কম-ভীতিপ্রদ যৌনরোগগুলির নাম জানানো যেতে পারে—গোপন অঙ্গের স্কেবিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ক্যানডিয়াসিস, পিউবিক লাইস, হারপস সিমপ্লেকস, ওয়ারটস, ভাইরাল হেপাটাইটিস বি। নন-ভেনেরিয়াল সংক্রমণ-গুলির মধ্যে পিনটা, বেজেল, এনডেমিক সিফিলিস এবং ইয়স উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে যৌনরোগগুলির দুই প্রধান সিফিলিস গনোরিয়া নিয়ে আলোচনা করি। এরা শরীরের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ ধ্বংস লীলা চালায়, যার শেষ পরিণতি মৃত্যু বা চিরকালীন অক্ষমতা হতে পারে।

বড় বড় নগর, বন্দর, শিল্প এলাকা এবং হিমালয়ের পাদদেশে সিফিলিসের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। 'স্বাস্থ্য হিন্দ' পত্রিকা জানাচ্ছেন ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ সিফিলিসে আক্রান্ত। হিমাচল প্রদেশ, কুলু উপত্যকা, উত্তর প্রদেশের জোনসর বাওয়াব এলাকায় সিফিলিস-আক্রান্ত লোকের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩০-৪০ ভাগ।

সিফিলিস সংক্রমণ ঘটায় ট্রেপোনেমা প্যালিডাম। রোগ-সংক্রমণের দুটি ধাপ আছে। প্রথমে—আরলি বা প্রাথমিক সিফিলিস। এ পর্যায়ে তিনটি অংশ আছে—প্রাইমারি, সেকেনডারি এবং আরলি লেটেনট। দ্বিতীয়ত—লেট সিফলস বা শেষ অবস্থা। এর চারটি অংশ—লেট লেটেনট, বিনাইন টারসিয়ারি সিফিলিস, কার্ডিও ভাসকুলার সিফিলিস, নিওরোসিফিলিস।

প্রাথমিক সিফিলিসে রোগজীবাণু দেহে প্রবেশের পর ৩০-৯০ দিনের মধ্যে রোগচিহ্ন প্রকাশ পায়। প্রথমে মুসুরির দানার মতো ফুসকুড়ি দেখা দেয়। পরে ফুসকুড়ি ছিঁড়ে যায় ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষত একাধিক হতে পারে, আবার একটিও হতে পারে। ঘায়ের কিনারাগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়। সাধারণত প্রাথমিক অবস্থায় কোনো ব্যথা বেদনা হয় না। দ্বিতীয় অবস্থা শুরু হলে অবশ্য যন্ত্রণা শুরু হতে পারে। গোপন অঙ্গ ছাড়াও শরীরের যে কোন জায়গায় সিফিলিসের ক্ষতের আত্ম-প্রকাশ হতে পারে। দেখা গেছে, যৌন-

সংসর্গের সময় যে-কোন একজনের সিফিলিস থাকলে অন্যজনের দেহে নানাভাবে তা সংক্রমিত হয়। আঙুলে স্পর্শের জন্য ডিজিটাল সিফিলিস দেখা যায়। চুম্বনের জন্য ঠোঁটের ওপরে ও কিনারায় সিফিলিসের ক্ষত সৃষ্টি হয়। স্তনে বিশেষ করে বৃন্ত আক্রান্ত হতে পারে। ক্ষত ছাড়াও জ্বর, মাথাধরা, রাতের বেলায় বাতের যন্ত্রণার বৃদ্ধি এসবও দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে সংক্রমণের দ্বিতীয় ধাপে। তারপর রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সারা অঙ্গে লাল কিংবা কালচে নীল রঙের ক্ষতে ভরে যায়।

শুরুতে ঠিকমতো চিকিৎসার সুযোগ না হলে লেট সিফিলিসের পালা। ব্যাধির তৃতীয় প্রহরে তখন শুধু সর্বনাশের ঘণ্টা বাজে। বিনাইন টারসিয়ারি সিফিলিস রোগ সংক্রমণের ৩-১০ বছর পরও প্রকাশ পেতে পারে। এ সময় ক্ষতের প্রধান চরিত্রের নাম গামা (Gumma)। দেহের ত্বকের ওপরও ক্ষত দেখা যায়। জিভ, নরম তালু, ঠোঁট, নাক, ফ্যারিংসে গামার ক্ষতের আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন হাড়, যেমন স্টারনাম, ক্লাভিকল, মেরুদণ্ডের হাড়, লম্বা হাড় প্রভৃতি হাড়েও ক্ষতের চিহ্ন ফুটে ওঠে। এছাড়া পাকস্থলী, যকৃৎ প্লীহা, শুক্রাশয়, অন্ত্র প্রভৃতির গামা হয়। লিমফ গ্ল্যাণ্ডগুলি বৃদ্ধি হয়।

কীভাবে সিফিলিসের সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে? প্রাথমিক স্তরে ডার্ক গ্রাউনড টেসট দ্বারা তা সম্ভব। এছাড়া সেরোলজিকাল টেসটগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। গবেষণাগারে যে সব টেসট হয়—ভেনেরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ ল্যাবোরেটরি টেসট (VDRL), ওয়াশারম্যান রিয়্যাকশন (WR) বা র‍্যাপিড প্লাজমা রিজিন কার্ড টেসট (RPRC)। এছাড়া—রিটার প্রোটিন কমপ্লিমেনট ফিকসেশন টেসট (RPCFT), ফ্লুরেসেন্ট ট্রেপোনাল অ্যান্টিবডি টেসট (FTA—ABS), ট্রেপোনেমা প্যালিডাম ইমবিলাইজেসন টেসট (TPI), ট্রেপোনেমা প্যালিডাম হিমাগ্লুটিনেশন টেসট (TPHA) উল্লেখযোগ্য। সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড (CSF) পরীক্ষার মধ্যে কোষ গণনা, প্রোটিনের গুণগত ও পরিমাণগত পরীক্ষা, হাড়গোড়ের ক্ষেত্রে রেডিওলজিকাল পরীক্ষার কথা বলা যায়।

বাচ্চাদের কনজেনিটাল সিফিলিসের সংক্রমণ হতে পারে। মা-বাবার রোগ জন্মসূত্রে শিশুকেও বহন করতে হয়। মানসিক-জড়তা ও বামনত্ব আসতে পারে, শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে। দাঁতের বিকৃতি হতে পারে, যাকে হাচিনসনস দাঁত বলা হয়। চক্ষু, হাড়, স্নায়ু, ভিসেরা সব কিছু আক্রান্ত হতে পারে।

বোম্বের সোশাল হাইজিন কাউনসিল জানাচ্ছেন, ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে গনোরিয়ার সংক্রমণের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তবে সংখ্যায় সিফিলিসের থেকে বেশি এটা বলা যায়। এবং অন্তত শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরাই এ রোগ বহন করে।

গনোরিয়ার সংক্রমণ আনে নেইসিরিয়া গনোরি। গনোরিয়া সিফিলিসের মতো পুরুষ, নারী, শিশু সকলেরই হতে পারে। ২-৭ দিনের মধ্যে সংক্রমণ স্পষ্ট হয়। কখনো ২ সপ্তাহও লেগে যায়। রোগী সাধারণত পেচ্ছাবের অসুবিধের কথা জানায় পেচ্ছাব করার সময় জ্বালা ব্যথা হয়। পেচ্ছাব করতে কষ্ট হতে পারে। কোন কোন সময় রক্ত বেরতে পারে। তাছাড়া হলুদ রঙের দুর্গন্ধময় তরল নিঃসৃত হয়। যৌন সংসর্গ ছাড়াও অনেক সময় স্পর্শ থেকেও গনোরিয়া হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সংক্রামিত ব্যক্তির বিছানায় শোওয়ার ফলে, তার তোয়ালে ব্যবহার করার ফলে এই রোগে তারা আক্রান্ত হয়। একেবারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে চোখে সংক্রমণের ফলে অফথালমিয়া নিওনাটোরাম হয়। পুরুষদের বেলায় ইউরেথ্রা, প্রসটেট, সেমিনাল ভেসিকল, এপিডিডার্মিস ও মেয়েদের বেলায় বারথোলিন গ্ল্যাণ্ড, ইউরেথ্রাল গ্ল্যাণ্ড, জরায়ুর সারভিকস, ফ্যালোপিয়ান টিউব গনোকক্কাল জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। এছাড়া রেকটাম আক্রান্ত হতে পারে।

ইনকিউবেশন পিরিয়ড

সিফিলিস :	১০-৯০ দিন
গনোরিয়া :	২-৭ দিন
স্যানক্রয়েড :	১-৫ দিন
এল জি ভি :	৩-২১ দিন
জি আই :	৮-৮০ দিন

গনোরিয়া সংক্রমণ চিহ্নিত করার জন্য গ্রাম স্টেন পদ্ধতি দ্বারা স্মেয়ার স্টেনের সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য পরীক্ষা —কালচার পদ্ধতি (চকোলেট আগার বা ব্লাড আগার মিডিয়ার সাহায্যে), গনোকক্কাল কমপ্লিমেনটে ফিকসেসন টেসট, ফ্লুরেসেনট অ্যানটিবডি টেসট।

স্যানক্রয়েড ভারতের সর্বত্র বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। সংক্রমণ ১-৫ দিনের মধ্যে বোঝা যায়। হিমোফিলাস ডুক্রি এই সংক্রমণ ঘটায়। গোপন অঙ্গে একাধিক যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি হয়। আলসার স্মেয়ার দ্বারা স্যানক্রয়েড বা সফট সোরের অস্তিত্ব পরীক্ষা করা হয়। কালচার ও বায়োপসি পদ্ধতিরও সাহায্য নেওয়া হয়।

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে লিমফো গ্রানুলোমা ভেনেরিয়াম (এল জি ভি) রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। মাদ্রাজের ভি ডি ক্লিনিকে দেখা গেছে শতকরা ৫ ভাগ এ রোগ আক্রান্ত। ভাইরাস সংক্রমণ দ্বারা এ রোগের আবির্ভাব। অবশ্যই যৌন সংসর্গের মাধ্যমে ৩-২১ দিনের মধ্যে শরীরে রোগ স্পষ্ট হয়। জননাঙ্গের ক্ষত ছাড়াও জ্বর, জয়েনটের বেদনা, ওজন হ্রাস, ক্ষিদে কমে যাওয়া এসব লক্ষণ আছে। এ রোগ ধরা যায় এ সব পরীক্ষায়—ভাইরাস আইসোলেশন পরীক্ষা, ফ্রেই টেসট, কমপ্লিমেনট ফিকসেশন টেসট ও বায়োপসি।

১৮৮২ সালে মাদ্রাজে ম্যাকলিয়ড সাহেব গ্রানুলোমা ইনগুইনাল (জি আই) রোগটিকে আবিষ্কার করেন। এর সংক্রামক জীবাণুকে আবিষ্কার করেন ওই মাদ্রাজেরই জেনোভান সাহেব। তার নামানুসারে ওই বিশেষ জীবাণুর নাম রাখা হয়েছে জেনোভানিয়া গ্রানুলোমাটিস। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, ওড়িষার সমুদ্র-উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। ১৯৬৮ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে অন্ধ্রের কাকিনাড়ায় মোট পুরুষ যৌনরোগীর শতকরা ৬·১ ভাগ এবং মোট মহিলা যৌনরোগীর শতকরা ৬·৯ ভাগ এই রোগে আক্রান্ত। রাজম ও রানজিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী মাদ্রাজের মোট যৌনরোগীর শতকরা ১·৫ ভাগ এই রোগী। যৌনসংসর্গের ৮-৮০ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। জননাঙ্গের ক্ষতের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা—স্মেয়ার ও বায়োপসি।

এককালে যৌনরোগী মাত্রই সমাজ কর্তৃক ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য বলে মনে করা হত। চিকিৎসার সুব্যবস্থাও ছিল না। পাপ ও অমঙ্গলবোধের আদিম ধোঁয়ায় এই রোগগুলি সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করত। গোপন রোগের নিরাময়ের দুর্বলতার সুযোগ হাতুড়েরা চিরকাল নিয়েছে। এখনো আমাদের মতো দারিদ্র্য পীড়িত দেশে অশিক্ষা ও সংস্কারের আলোছায়ায় এদের চিকিৎসা-ব্যবসা খুব ভাল-মতো চলছে। আর আছে একদল—ময়দানে যে কোনদিন গেলেই দেখতে পাবেন পেছনে একটা লম্বা মানব-দেহের অভ্যন্তর-চিত্রপট টাঙিয়ে অল্প শক্তির মাইক্রোফোন বা খালি গলায় পৌরুষ, রমণক্ষমতা প্রভৃতির অভিনব ব্যাখ্যা শুনিয়ে যৌন রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে ভয় দেখানোর প্রয়াসে অনেক ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করে হাতুড়ে দাওয়াই বিক্রি করে। সামনে সাজানো থাকে কোন বিশেষ স্বপ্নে প্রাপ্ত ঠাকুরের আশীর্বাদ ধন্য রেজিসটার্ড নমবর ছাপা পেটেনট ওষুধ কিংবা খোদ আকবর-বাদশা ব্যবহৃত খানদানি ইউনানি সালসা। এছাড়া জিপসি বেদেনীদের কাছেও অনেককে যৌনরোগের ওষুধ খুঁজতে দেখেছি, যা কিনা পশু পাখির ঠোঁট, হাড়ের গুঁড়ো হতে পারে, তাগা-তাবিজও হতে পারে।

আর প্রাচীনকাল থেকে এখনো পর্যন্ত শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে একটা খুব ভুল ও বীভৎস ধারণা প্রচলিত আছে যে, সত্যিকার 'ভার্জিন' বালিকা ও কিশোরীর সঙ্গে সহবাস করলে যৌনরোগ ভাল হয়ে যায়। এ রকম অভিপ্রায়ে 'রেপ কেস' হাসপাতালে দেখতে পাওয়া বিরল নয়। আমি এ ধরনের একটি ঘটনা জানি, যেক্ষেত্রে মাত্র বছর দুয়েকের বাচ্চা মেয়েকে এক মধ্য বয়সী পুরুষ ধর্ষণ করেছিল তার রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে। মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও অজ্ঞানতা কতদূর সর্বনাশ আনতে পারে ভাবলে অবাক হতে হয়।

আগে সিফিলিসের চিকিৎসায় আর্সেনিকের ব্যবহার ছিল। সে সময় মারকিউরিয়াল প্রিপারেশনও খুব চলত। ১৯২১ সালে বিসমাথের ব্যবহার শুরু হলে অবশ্য আর্সেনিক বা মার্কারির প্রচলন কমে যায়। প্রায় দুই দশক ধরে বিসমাথ ব্যবহারের পর আলেকজান্দার ফ্লেমিং-এর সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার—ব্যাঙের ছাতা থেকে পেনিসিলিন—যৌনরোগের চিকিৎসার জগতে অন্য সব ওষুধকে বাতিল করে দিল। অ্যানটিবায়োটিক দুনিয়ার অভিযাত্রা আরো সফল ও উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হল। বিভিন্ন অ্যানটিবায়োটিকের সাহায্যে যৌনরোগের চিকিৎসা এখন খুবই সুলভ এবং ঠিকমতো চিকিৎসা করলে একেবারেই নীরোগ হওয়া সম্ভব। অবশ্য তার জন্য সবসময় রোগীর সহযোগিতা প্রয়োজন। বেশিরভাগ সময় ওষুধ-প্রয়োগের কিছুদিন বাদে ক্ষত নিরাময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর দেখা পাওয়া যায় না—অথচ পুরো মাত্রার ওষুধের ব্যবহার না হলে আবার রোগের আবির্ভাব হওয়াও স্বাভাবিক। পূর্ণ নীরোগ হবার পরও মাঝে মাঝে চেক-আপ-এর প্রয়োজন। যৌনরোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি শোনার পর প্রথমেই ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞেস করেন—'বাইরের মেয়েছেলের কাছে কতদিন আগে গেছলেন?' রোগের উৎপত্তিস্থলের সঠিক খবর জানাতে অনেকে দ্বিধা করেন। কিন্তু কতদিন আগে রোগের সংক্রমণ ঘটেছে, তা ঠিকমতো জানতে না পারলে চিকিৎসার অসুবিধা হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে স্বামীকেও পরীক্ষা করা হয়। স্বামী সুস্থ থাকলে স্বাভাবিকভাবেই রোগিণী অন্য কোন পুরুষের শয্যাসঙ্গী হয়েছেন কিনা তা জানার প্রয়োজন হয়, ঠিক খবর পেলে সেই পর-পুরুষকে ডেকে পাঠিয়ে তারও চিকিৎসা করা হয়। আসলে যেহেতু যৌনরোগ সৃষ্টির জন্য সঙ্গীর প্রয়োজন হয়, সেজন্য রোগ আহরণের মূল সূত্রটির চিকিৎসা না করলে সমস্ত চিকিৎসা-আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়।

পশ্চিমবাংলায় যৌন রোগ কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার কারণ নানাবিধ। আগেই বলেছি যেহেতু এ রোগ সামাজিক ব্যাধি, সুতরাং সবার আগে সমাজের চিকিৎসাই প্রয়োজন।

এ রাজ্যে সব থেকে বেশি রোগীর সংখ্যা মহানগরী কলকাতা ও শহরতলী এলাকায় একাধারে বন্দর, অন্যদিকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন জীবিকার সন্ধানে এ শহরে মাথা খুঁড়ে মরছে। আর আছে বিশাল বস্তি এলাকা, গোটা শহরকেই বসন্তের গুটির মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শিক্ষার পবিত্র আলো গ্রহণের জন্যও প্রতি বছর হাজার হাজার তরুণ-তরুণী এ শহরে আশ্রয় নেয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এরকম বিশাল শহরের জটিল গোলকধাঁধায় স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের যৌন সমস্যা অন্য সব সমস্যাগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। চিত্তচাঞ্চল্য ঘটানোর মতো নানাবিধ উপকরণেরও অভাব নেই এ মহানগরীতে। হিন্দি সিনেমা থিয়েটারের ক্যাবারে বা পোসটারের অশ্লীল প্রকাশভঙ্গীর কথা না হয় বাদই দিলাম, পুলিশের সঙ্গে মাঝে মধ্যে চোর পুলিশ খেলে দিব্যি রাশি রাশি যৌন পত্রিকা খোলা ফুটপাথে সকলের চোখের সামনে বিক্রি হয়।

গনোরিয়া সংক্রমণ : ১৯৭১

দেশ	প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায়
সুইডেন	৫০০
ডেনমার্ক	৩১৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩০৭.৫
কানাডা	১৫৮.৭

কলকাতার কয়েকটি খ্যাতনামা 'লালবাতি এলাকায়' সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি—ওখানকার বাসিন্দাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। কাগজে কলমে এ ধরনের কিছু নিয়মকানুন থাকলেও বাস্তবে তা পালিত হয় না। আর ব্রিটিশ আমল বিগত হলেও দেশের স্বাধীন সরকার পুলিশের চরিত্র পালটানোর কোন চেষ্টা করেননি। তাই বেশ্যাবৃত্তি বেআইনী হলেও স্থানীয় থানার সঙ্গে ঘুষের কারবার খোলাখুলি চলে। যদিও এরা প্রায় সকলেই যৌনরোগের প্রধান আড়ত, তবে অনিয়মিত পেনিসিলিন ইনজেকসন এদের ভিতরের রোগ বাইরের চক্ষু থেকে গোপন রাখে কিছু অসাধু চিকিৎসক এভাবে অসম্পূর্ণ চিকিৎসার সুযোগ করে দিয়ে এক সামাজিক অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এরা বেশিরভাগই যৌনরোগ সম্বন্ধে খুব একটা সচেতন নয়। বেশি বয়সে শারীরিক বিকৃতি এলে তা পাপের ফল বলেই মেনে নেয়। এরা প্রায় সকলেই ঈশ্বরবিশ্বাসী। নিয়মিত উপাসনা করে। বেশির ভাগই বংশ পরম্পরায় ব্যবসা চালাচ্ছে। টাউট, দালাল এসবের মাধ্যমে অনেক নিরীহ ভদ্রঘরের মেয়েও ছিটকে সেখানে যায় ঠিকই, তবে সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য প্রচুর মিথ্যে গল্প এরা শোনায়, যা প্রায় ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ইদানিংকালে তরুণ ছাত্রদের মধ্যে বেশ্যালয়ে গমন ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার এক মেডিকেল কলেজের যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ জানালেন, শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে নানারকম হতাশা, পারিবারিক গোলযোগ, ও মাদক ঔষধ ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে লালবাতি এলাকায় যাওয়া বেড়ে যাচ্ছে। হাই সোসাইটির উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমেয়েরা, যারা আধুনিক হবার জন্য আজকাল বিদেশী অনুকরণে ফ্রি-সেকসের কথাবার্তা উচ্চস্বরে বলে, এরা বেশি মাত্রায় যৌনরোগের শিকার হচ্ছে। আমেরিকা থেকে আগত হিপি-সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌনরোগের ছড়াছড়ির খবর বাসি হয়ে গেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের মধ্যে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের ফলে বিয়ের বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্য স্বাভাবিক যৌন-আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য এরা সহজ পথের সুযোগ নিচ্ছে। আর ফিলম, বা জনপ্রিয় উপন্যাসের নায়ক বা ফেবারিট কবি শিল্পী সাহিত্যিক প্রভৃতি গুরুদের প্রভাবে অল্পবয়সী ছেলেদের 'মদে দেবদাস' হয়ে চন্দ্রমুখীদের খুপরীতে প্রবেশের ঘটনাও কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এলিয়টের পরে আধুনিক বাংলা কবিতায় যার প্রভাব সব থেকে বেশি পড়েছে, সেই শার্ল বোদলেয়ার অল্প বয়স থেকেই সিফিলিস রোগে ভুগেছেন।

আর নিচুতলার কারখানার শ্রমিক, রিকসাওয়ালা, দোকানদার বা চাকুরে—যারা ঘর সংসার ফেলে রেখে এসেছেন তাদের গ্রামে এই প্রবাসের জীবনে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য শহর কলকাতা তার লাল আলোর বিষাক্ত লণ্ঠন ঝুলিয়ে রেখেছে এখানে সেখানে। পার্ক স্ট্রিট কি ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে ওৎ পেতে বসে থাকে দালাল রিকসাওয়ালারা; খদ্দেরকে পৌঁছে দেয় বারাঙ্গনার দুয়োরে। প্রকাশ্য দিবালোকে এলিট, মেট্রো, লাইট হাউস, নিউ সিনেমা প্রভৃতি চিত্রগৃহের পোর্টিকোতে অথবা অপরাহ্ন বা সন্ধ্যেবেলায় কার্জন পার্ক, বিশাল গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া, আউটরাম ঘাট, ঢাকুরিয়া লেক, কালিঘাট ব্রিজ বা ইডেন গার্ডেনে দেহ-পসারিণীরা সহজে দ্রষ্টব্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের নিজস্ব ডেরা বা ঝোপড়া থাকে। অনেক সময় খদ্দেররাই কাছাকাছি হোটেল বা অন্যত্র নিয়ে যান। ভদ্রভাষায় কলগার্ল বললেও এরা সকলেই

যৌনব্যাধির জীবন্ত বারুদখানা। উপোসী নাবিকদের মধ্যে বন্দরে জাহাজ ভেড়া মাত্র বেশ্যালয়ে গমনের ধুম পড়ে যায়, এ অতি প্রাচীন দৃশ্য।

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন গ্রাম ও মফস্বলে শহরগুলিতে বারবধূরা স্থানীয় চাহিদা মেটাচ্ছে। সকলেই যে আলাদা ঘর বেঁধে খোলাখুলি রোজগার করে তা নয়, দিনের বেলায় অন্য পেশাতেও ব্যস্ত থাকে। গ্রাম বাংলায় যে কোন বড় মেলায় একপাশে এরাও কুটীর সাজায়। রোগও যথারীতি ছড়াচ্ছে। মূলত দারিদ্র্যের কারণে আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে এ বৃত্তি অবলম্বনের ইতিহাস খুব পুরোনো এবং এখনো সজীব। আন্দামান ও বিভিন্ন দ্বীপে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ সভ্য মানুষের পৌঁছে দেওয়া যৌনরোগ। কয়েকটি মফস্বল শহর ঘুরে যা দেখেছি, ক্রমবর্ধমান বেশ্যাবৃত্তির সমস্যা রীতিমত ভয়াবহ। নিম্ন মধ্যবিত্ত মেয়েরাও এ ব্যবসায় প্রচুর পরিমাণে নামছে। নিত্য বৃদ্ধিশীল বেকারি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব মানুষের চিরাচরিত মূল্যবোধগুলিকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করছে না।

যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি বেশ্যালয় স্থাপনের নজিরও বেশ প্রাচীন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধক্লান্ত ইউরোপীয় দেশগুলিতে হঠাৎ যৌন-রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার পরই এ ব্যাপারে সবার টনক নড়ে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। অসংখ্য নাইট ক্লাব, জুয়াড়ি আড্ডা ও বেশ্যাখানার আধুনিক চাহিদায় পতঙ্গের মতো স্ফূর্তিবাজ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়তে কখনো দ্বিধা করে না। পুড়ে মরতেও দেরি হয় না। তবে অত হিসেব কষে কে আর আনন্দ খরিদ করে। সাম্প্রতিক কালে ভিয়েৎনামে দীর্ঘকাল যুদ্ধচলাকালীন বলা হত পৃথিবীর বৃহত্তম বেশ্যাখানা সায়গন। প্রবাসে যুদ্ধরত মার্কিন সৈন্যদের তৃপ্তি মেটানোর জন্য হাজার হাজার ভিয়েৎনামী মেয়ে এই ব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়েছিল। সেজন্য স্বাধীন ভিয়েৎনামে একটি প্রধান সমস্যা—যৌনরোগ।

চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে যৌনরোগ ছড়িয়ে রয়েছে। পেনিসিলিন ব্যবহার শুরুর পর ১৯৫০ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে সিফিলিস ও গনোরিয়া অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে আবার সংখ্যা বাড়ছে। বলা যায় মহামারী আকারে তা বাড়ছে। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জানা গেছে বিশ্বে এখন প্রায় ১৫ কোটি লোক গনোরিয়ায় এবং প্রায় ৫ কোটি লোক প্রাথমিক সিফিলিসে আক্রান্ত। ১৯৭০ সালের এক সমীক্ষার ফলাফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছেন গত দশকে বিশ্ব যে পারিবেশিক/সামাজিক ও ব্যবহারিক মূল্যবোধগুলির অবমূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে, তারই ফলশ্রুতি এই ক্রমবর্ধমান যৌনরোগ। নিকসন সরকারের চিকিৎসা বিভাগীয় সহকারী সচিব ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে জানিয়েছিলেন, সে দেশে প্রতি বছরে শতকরা দশ থেকে পনের জন নতুন করে সিফিলিস বা গনোরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন।

যৌনরোগ ঃ চিকিৎসা

আরলি সিফিলিস ঃ ১) বেনজাথিন পেনিসিলিন ২৪ লক্ষ ইউনিট একবার মাত্র। ২) প্রোকেন পেনিসিলিন ৩ লক্ষ ইউনিট দিনে দু'বার ১০ দিনের জন্য।

লেট সিফিলিস ঃ বেনজ্যাথিন পেনি-সিলিন ২৪ লক্ষ ইউনিট প্রতি সপ্তাহে, মোট ৪টি ইনজেকসন।

এ ছাড়া সিফিলিসে ব্যবহৃত হয় ঃ টেট্রা-সাইক্লিন, আয়োডিন প্রভৃতি।

কনজেনিটাল সিফিলিস ঃ প্রোকেন পেনিসিলিন ১ লক্ষ ইউনিট ১০ দিনের জন্য।

গনোরিয়া ঃ ১) প্রোকেন পেনিসিলিন ৩ লক্ষ ইউনিট এবং ক্রিস্টালিন পেনিসিলিন ১ লক্ষ ইউনিট দিনে দুবার ৪ দিনের জন্য ২) টেট্রাসাইক্লিন ২৫০ এম জি প্রতি ৬ ঘণ্টায় ৫দিনের জন্য। ৩) স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট ১ গ্রাম প্রতিদিন ২ দিনের জন্য।

স্যানক্রয়েড ঃ ১) সালফাডিমিডিন ১ গ্রাম প্রতি ৬ ঘণ্টায় ৬ দিনের জন্য। ২) স্ট্রেপটোমাইসিন ১ গ্রাম দিনে দুবার ৫ দিনের জন্য। ৩) টেট্রাসাইক্লিন ২৫০-৫০০ এম জি দিনে চারবার ১০ দিনের জন্য।

লিমফো গ্রানুলোমা ভেনেরিয়াম ঃ ১) সালফোনামাইড ১ গ্রাম দিনে চারবার ৭-১৪ দিনের জন্য। ২) টেট্রাসাইক্লিন ৫০০ এম জি প্রতি ৬ ঘণ্টায় ১৪ দিনের জন্য। ৩) সার্জিকাল।

গ্রানুলোমা ইনগুইনালি ঃ ১) স্ট্রেপ-টোমাইসিন ২ গ্রাম প্রতিদিন ১০ দিনের জন্য। ২) টেট্রাসাইক্লিন ৫০০ এম জি দিনে চার বার ১৪ দিনের জন্য। ৩) ক্লোরমফেনিকল ৫০০ এম জি দিনে চারবার ১৪ দিনের জন্য।

(কোন অবস্থাতেই নিজে থেকে চিকিৎসা করবেন না। সব সময় কোন বিশিষ্ট যৌন-বিশেষজ্ঞ বা স্থানীয় ভি ডি ক্লিনিকের পরামর্শ নেবেন।)

আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে এই সব সামাজিক ব্যাধি প্রসঙ্গে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা হয়েছে। ন্যাশনাল ইনসটিটুট অব কম্যুনিকেবল ডিজিজেস এক পরিকল্পনায় যৌনসংসর্গের ফলে উদ্ভূত রোগগুলির সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্য সার্ভে-কাম-ডিটেকশন টিম গঠন করেছেন। ১৯৫৬ সালে সরকারিভাবে ন্যাশনাল ভি ডি কনট্রোল প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়। এরা যে সব ব্যবস্থা নেন, তার মধ্যে ছিল, প্রতিটি হাসপাতালে বিশেষ করে শিল্পনগরী ও বন্দর এলাকায় ভি ডি ক্লিনিক স্থাপন। ইদানিংকালে বিভিন্ন পরিবারে এবং প্রসূতিদের মধ্যে যৌনরোগ অনুসন্ধানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তপরীক্ষার কাজও এ ব্যাপারে সাহায্য করে। আমাদের মতো হাজার রকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং অনগ্রসর দেশে এ সব কাজ খুব নিপুণভাবে সম্পন্ন করা যে দুরূহ ব্যাপার, এ কথা বলাই বাহুল্য। এর জন্য সাধারণ মানুষের মনে যৌনরোগ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

আর বেশ্যাবৃত্তি সম্পর্কেও সরকার কোন সময়ে স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেননি। আইন করে এই আদিম বৃত্তি বন্ধ করা যায় না, এ কথা শিশুও জানে। এ প্রসঙ্গে 'দি সাপ্রেশন অব দ্য ইমরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট, ১৯৫৬' এবং 'দি ড্রাগস অ্যানড ম্যাজিক রেমিডিজ (অব-জেকশনেবল অ্যাডভারটাইজমেনট) এর কথা উঠতে পারে। বেশ্যাবৃত্তি উচ্ছেদ, মিথ্যে বিজ্ঞাপন, হাতুড়েদের চিকিৎসা ও ঔষধ বিক্রি বন্ধ করার ব্যাপারে আইন দুটি কতটুকু সফল হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায়। যৌন-রোগ নির্মূল নিশ্চিত করার জন্য বেশ্যাবৃত্তিকে উচ্ছেদ করা যেহেতু সম্ভব নয়, সুতরাং ওই জীবিকার লাইসেনস প্রথা প্রয়োগের কথা অনেকে বলছেন। এর ফলে সুনির্দিষ্টভাবে, লাইসেন্স-প্রাপ্ত বারাঙ্গনাদের নিয়মিত চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। সম্প্রতি এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সামাজিক পুনর্বাসন মন্ত্রকের এক মুখপাত্র হতাশাজনক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'বেশ্যাবৃত্তিতে লাইসেনস প্রথা প্রচলনের কোন অভিপ্রায় সরকারের নেই।' তিনি এক অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে বলেছেন, 'কারণ তাহলে এই অমঙ্গলাশ্রয়ী বৃত্তিকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৫০ সালের একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনে ভারত স্বাক্ষর করেছিল, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লালবাতি এলাকার বাসিন্দাদের নিত্য বঞ্চনার সংকোচন ঘটানো।

তাই মনে হয়, যৌনরোগ সম্বন্ধে যেমন বিদ্যালয় স্তর থেকেই স্বাস্থ্য ও যৌনশিক্ষার মাধ্যমে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, সেই সঙ্গে একটি পরিচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখাও বোধহয় অন্যায় নয়, যে সমাজে সংসারের সীমান্তে দাঁড়িয়ে কোন নারী শুধু মেয়েমানুষ বলেই দেহ বিক্রি করে গ্রাসাচ্ছাদন করবে না। ★

আলোকচিত্র ঃ দীপক ভট্টাচার্য

চৌকিদার দফাদার—সর্বঘটে কাঁঠালি কলা

নিজস্ব প্রতিনিধি

ছোটবেলায় গ্রামে যখন থাকতাম তখন মাঝরাতে নীরব নিঝুম পল্লী পরিবেশকে সচকিত ক'রে হাঁক উঠত : 'বাবু জাগন আছেন তো ? সব হুঁশিয়ার।' বাবা সাড়া দিতেন, 'হ্যাঁরে সজাগ আছি গগন।' আমরা জানতাম ওটা হ'ল গগন চৌকিদারের রাত-জাগা টহল। গ্রামে ছিল অবাধ কর্তৃত্ব দফাদার আর চৌকিদারদের। চৌকিদারের নেভি ব্লু জামা আর পাগড়ি। দফাদারের খাঁকি জামা লাল পাগড়ি। দু-জনেরই চামড়ার বেলটে পেতলের তকমা। আজও তেমনই তারা আছে, শুধু ইউনিয়ন বোর্ডের জায়গায় হয়েছে অঞ্চল পঞ্চায়েত।

ছোটবেলায় কত স্মৃতি মরে হেজে গেছে কিন্তু মাঝরাতে এখনও হঠাৎ ঘুম ভাঙে, স্বপ্নের মধ্যে যেন গগন চৌকিদারের হাঁক শুনি, 'বাবু সজাগ তো ?' কিন্তু আমরা এইসব দফাদার চৌকিদারদের সম্পর্কে সজাগ আছি তো ?

আমাদের গ্রামের সে-ই ছোটবেলার দফাদার অমূল্যদা নাকি এখনও সেই কাজই করে চলেছেন। প্রত্যেক মঙ্গলবার শহরের কোতয়ালি থানায় সাপ্তাহিক হাজিরা দিতে ঠিকই আসেন। একদিন হাজির হলাম অমূল্যদার দাওয়ায়। কুশল বিনিময়ের পর বললাম, 'কত কাল দফাদারের কাজ করছেন ?'

চাঁদির চশমা প'রে নিয়ে অমূল্যদা মেলে ধরলেন এক সনদ। বললেন, 'সেই বৃটিশ আমল থেকে আছি, তখন মাইনে ছিল তিন-টাকা।' তিনটাকা মাইনে ? অবাক হয়ে সনদটা দেখলাম। লেখা আছে :

Form of SANAD to a Dafadar *under section* 53 of Bengal Act VI of 1870.

১৯৩৫ সালের এই সনদের বলেই আজও কাজ করে যাচ্ছেন অমূল্যদা ! এর মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, হালফিল পঞ্চায়েত রাজও কায়েম হ'ল কিন্তু চৌকিদার দফাদারদের নতুনত্ব বিশেষ কিছু হয়নি। অমূল্যদা ম্লান হেসে বললেন, 'সায়েব গিয়ে বাঙালি কর্তা হ'ল, ইউনিয়ন বোর্ড গিয়ে পঞ্চায়েত হল, দেশ ভাগ হয়ে উদ্বাস্তু এসে গ্রামের মানুষ আর আমাদের কাজ দুইই অনেক বেড়ে গেল, গ্রামে ইলেকট্রিক এল, ট্র্যাকটর এল, শ্যালো হল কতবার ভোট হল, কত গরমেন্ট এল গেল, কিন্তু আমাদের

১৯২২ সালের বেঙ্গল ভিলেজ চৌকিদারি অ্যাকট অনুযায়ী চৌকিদার ও দফাদারদের পরিধেয় তালিকা ও তৎকালীন নির্ধারিত মূল্য

॥ দফাদার ॥

বস্তু	দাম	ব্যবহার কাল
একটি খাকি জামা	১ টাকা ১২ আনা	২ বছর
একটি খাকি কাঁধ ব্যাগ	৪ আনা	ঐ
একটি লাল পাগড়ি	১ টাকা ৪ আনা	ঐ
একটি লাল ক্রশ বেলট	৩ আনা ৬ পয়সা	ঐ
একটি চামড়ার বেলট	৮ আনা	৪ বছর
একটি পেতলের তকমা	৮ আনা	১০ বছর
একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন	২ টাকা ৮ আনা	২ বছর
মোট	৬ টাকা ১৫ আনা ৬ পয়সা	

॥ চৌকিদার ॥

বস্তু	দাম	ব্যবহার কাল
একটি নীল জামা	১ টাকা ৩ আনা	২ বছর
একটি নীল পাগড়ি	১৫ আনা	ঐ
একটি ক্রশ বেলট	৩ আনা ৬ পয়সা	ঐ
একটি নীল কাঁধ ব্যাগ	৪ আনা	ঐ
একটি চামড়ার বেলট	৮ আনা	৪ বছর
একটি পেতলের তকমা	৮ আনা	১০ বছর
মোট	৩ টাকা ৯ আনা ৬ পয়সা	

☆ এই পোশাক এখনও চলছে।

কাজও কমল না, পোশাকও পালটালো না মর্যাদাও বাড়লো না। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আমাদের নেয়নি, রাজ্য সরকারও আমাদের সরকারি কর্মচারি করেননি। শুধু খানিকটা মাইনে বেড়েছে। কিন্তু সম্মান কই, মর্যাদা কই, ভবিষ্যৎ কি আছে আমাদের ?'

অমূল্যদা বললেন, 'তবে মনে রাখবেন আমাদের মাইনের সবটা আমরা অনেকেই পাইনা। যেমন ধরুন, বি ডি ও-র অংশটা পেলেও সব অঞ্চল তার অংশটুকু দেন না। আমাদের অঞ্চল ৮৭ টাকার বদলে ৪০ টাকা দেন। তাছাড়া হারিকেন দেওয়ার কথা। পাই না। দুবছর অন্তর পোশাক দেওয়ার কথা গত সাত বছরে আমরা পোশাক পাইনি। প্রতি সপ্তাহে থানায় হাজির দিতে যেতে হয় তারজন্যে টি এ পাই না।' এমনই অভিযোগের লম্বা ফর্দ।

আমি বললাম, 'আপনাদের কাজটা কি ?'

: জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজই চৌকিদার আর দফাদারকে করতে হয়। জন্ম মৃত্যুর রেজিস্টারি থেকে আরম্ভ করে গ্রামে শান্তি শৃঙ্খলার রক্ষা, সন্দেহজনক আগন্তুক সম্পর্কে থানাকে জানানো, চোর ডাকাত ধরা, নির্বাচনে সাহায্য, বড় সরকারি অফিসার যে কেউ এলে উপস্থিত থাকা। খরা বন্যায় ত্রাণ কার্য। দাঙ্গা থামানো......ধরতে গেলে আমরা সর্বঘটে কাঁঠালি কলা।'

'পশ্চিমবঙ্গ দফাদার ও চৌকিদার সমিতি' গঠিত হয়েছে বেশ ক'বছর আগে। সম্মেলন, ডেপুটেশন ইত্যাদি সংগ্রামের সব হাতিয়ারই এরা নিয়েছেন। তবু অভিযোগ, থেকে যাচ্ছে দাবি থাকছে মর্যাদা ও সুযোগের। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অমূল্যদা বললেন, 'আমাদের সব কিছু নিয়ে সরকারকে বড় করে ভাবতে হবে। আমরা কেন পুলিশ রেশন পাবো না ? গত বন্যায় ত্রাণের কাজে অনেকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পেয়েছেন, আমরা পাইনি কেন ? আমরা কি সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিও হতে পারি না ? আমরা এখন হাঁ করে চেয়ে আছি পঞ্চায়েত মন্ত্রী আমাদের জন্যে কি করেন আর পে কমিশন কি বলেন।'

জনৈক এস ডি ও কে চৌকিদার দফাদার-দের সমস্যা ও দাবির কথাগুলি জানিয়ে তার মতামত চাইলাম। বললেন, 'ভাববার কথা বটেই। আসলে ওরা আনডিফাইনড সেমি-গভর্নমেনট পারসনস হ্যাভিং নো স্পেসিফিক ডিউটিজ। ওদের ওপর আমাদের কর্তৃত্ব অনেকটাই কাগুজে। জানেন কি, নকশাল হাঙ্গামার সময় থেকে ওরা রাতের টহল বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আমরাও কিন্তু ওদের এ ব্যাপারে জোর করতে পারি না। তবে একটা কিছু করা উচিত। সামথিং পজিটিভ অ্যানড ট্যানজিবল।' ★

কে বড়—গাভাসকর, না বিশ্বনাথ?



শাক্যদেব

ভারতীয় ক্রিকেট বলতে এখনও পর্যন্ত এই দুই শালা-ভগ্নীপতিকেই বোঝায়। এটা নিঃসন্দেহে গৌরবের কথা নয়। বরং লজ্জার। এতবড় একটা দেশের এত ক্রিকেটারের মধ্যে এখনও এই দুজনকে বাদ দিলে ভারতীয় ক্রিকেট পঙ্গু হয়ে যাবে—এটা নিশ্চয় আনন্দের বা গৌরবের নয়। অথচ এটাই সত্যি। একে উপেক্ষা করার উপায় নেই।

বিশ্বনাথ খেলার দিক দিয়ে গাভাসকরের চেয়ে সিনিয়র। ১৯৬৯-৭০ সিরিজে কানপুরে অসট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেসটে বিশ্বনাথের প্রথম আত্মপ্রকাশ। কিন্তু শুরুতেই বিপর্যয়। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শূন্য রানেই বিদায় নিতে হয় বিশ্বনাথকে। হতাশায় ভেঙে পড়েছিল ভিশ। সান্ত্বনা দিয়েছিলেন টাইগার পতৌদি। দ্বিতীয় ইনিংসে সারা মাঠে আগুন ঝরিয়েছিল ভিশ। জীবনের প্রথম টেসটেই সেনচুরি। ১৩৭। তার জীবনের প্রথম ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের সেনচুরির মতই। বিশ্ব ক্রিকেটে এই রেকরড এখনও পর্যন্ত একমাত্র বিশ্বনাথেরই রয়েছে।

এরপর থেকে একটি মাত্র সিরিজ ছাড়া বিশ্বনাথের ব্যাট থেমে থাকেনি। ৭০-৭১ এর সিরিজে ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে ওয়েসট ইনডিজে বিশ্বনাথের সময়টা ভাল যায়নি। একমাত্র জরজটাউনে দ্বিতীয় টেসটের প্রথম ইনিংসে বিশ্বনাথের ৫০ রানই উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া প্রায় সব টেসটেই ব্যর্থতা। অথচ ওই সিরিজ থেকেই গাভাসকরের আত্মপ্রকাশ। এক সিরিজে তিনটি সেনচুরি, একটি ডবল সেনচুরি, ৫০-এর ওপর তিনবার রান। ব্যর্থতা শুধু ব্রিজটাউন টেসটের প্রথম ইনিংসে। গাভাসকরের রান ছিল মাত্র ১।

৭০-৭১-এর পর থেকে বিশ্বনাথ-গাভাসকর কোনও টেসট সিরিজ নেই যেখানে একসঙ্গে খেলেননি। আঙুলের আঘাতের জন্য ৭৪-৭৫এ ভারতে ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে দিল্লি, কলকাতা এবং মাদরাজ টেসটে খেলেননি গাভাসকর। এছাড়া প্রায় সব টেসটেই হয় গাভাসকর নয় বিশ্বনাথ ভারতকে টেনে নিয়ে গেছেন হয় বড় রানের দিকে নয় জয়ের দিকে। এবং তা এখনও চলছে।

* *

উচ্চতায় গাভাসকর বিশ্বনাথ দুজনেই প্রায় সমান সমান। পাঁচফুটের পর এক ইঞ্চির এদিক ওদিক। খেলার দিকেও প্রায় তাই। ক্রিকেটে রেকরড অনেক কথাই বলে কিন্তু রেকরডই ক্রিকেটের সব কথা নয়। গাভাসকর টেসট ক্রিকেটে আট হাজার রান বা ২৯টির বেশি সেনচুরি করলেও স্যার গ্যারি সোবারস বা স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের কৌলিন্য বিন্দুমাত্র নষ্ট হবে না। তেমনি রেকরডের পাহাড় গড়লেও গাভাসকর বিশ্বনাথের খেলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ম্লান করতে পারবেন না।

পৃথিবীর সব ক্রিকেট বোদ্ধাই গাভাসকরকে এখন বিশ্বশ্রেষ্ঠ ওপেনার হিসেবে মেনে নিয়েছেন। ওপেনার হিসেবে সব সেনচুরির রেকরডই গাভাসকরের মুঠোয়। টেসটে বাইশটি সেনচুরি, ক্যালেনডার ইয়ারে তিন তিনবার হাজার রানের রেকরড গাভাসকরেরই। সেদিক দিয়ে দেখলে রেকরডের ঝুলিতে বিশ্বনাথের সংগ্রহ কম। কিন্তু সৌন্দর্য? শিল্প? সেসবই তো বিশ্বনাথের খেলায়। সেখানে হাত এখনও কারোর পড়েনি।

মনে আসে ৭৪-৭৫ সালে লয়েডের

খেলাধুলা

ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে মাদরাজে বিশ্বনাথের ইনিংসটি। সংহার মূর্তি ধরেছিলেন অ্যানডি রবার্টস। টলেছিলেন সবাই। টলেননি শুধু বিশ্বনাথ। ভারতের ১৯০ রানের মধ্যে বিশ্বনাথের একার সংগ্রহই ছিল ৯৭ নট আউট। টনি কোজিয়ার বিশ্বনাথের ওই ইনিংসটিকে অসাধারণ বলে বর্ণনা করেছিলেন। তার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল ৬৩তে লরডসে হল-গ্রিফিথের বিরুদ্ধে টেড ডেকসটারের ৭২টি অমূল্য রান। টেসট ক্রিকেটের ইতিহাসে ডেকসটারের ওই ৭২ যেমন চিরকালের সৌন্দর্য হিসেবে বর্ণিত হবে তেমনই লেখা থাকবে অ্যানডি রবার্টসের বিরুদ্ধে বিশ্বনাথের ৯৭ রান।

আরও আছে। ওই বছরেই ইডেনে বিশ্বনাথের ১৩৯। পরের বছর পোর্ট অব স্পেনে ১১২, ৭৬-৭৭এ কানপুরে প্রায় অন্ধকারের মধ্যে নিউজিল্যানডের তাবড় তাবড় ফাসট বোলারদের পিটিয়ে ১০৩ নট আউট বা ৭৮-৭৯ মাদরাজে কালীচরণের ওয়েসট ইনডিজের বিরুদ্ধে ১২৪ —সবগুলিই চিরকাল সাজিয়ে রাখার মত। এটা ভুললে চলবে না লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, কৃপাল সিং, আব্বাস আলী বেগরা যা পারেননি বিশ্বনাথ তা পেরেছেন বিশ্বনাথ বাদে অন্য কোনও ভারতীয়ই জীবনের প্রথম টেসটে সেনচুরি করার পর জীবনে টেসটে দ্বিতীয়বার আর সেনচুরি করতে পারেননি। বিশ্বনাথ শুধু যে তা করতে পেরেছেন তাই নয়, সব সমেত করেছেন এখনও পর্যন্ত ১১টি সেনচুরি যার ওপরে আছেন একমাত্র তারই শ্যালক এবং উমরিগড়।

গাভাসকরের ব্যাপার স্যাপার অবশ্য অন্যরকম। নিজে বলেন, ৭০-৭১ এর পোর্ট অব স্পেনের ২২০ নয়, ৭৮-৭৯ তে ইডেনে ১৮২ নট আউট নয়, এই সেদিনের ওভালে ২২১ও নয়—ওর জীবনের এ যাবৎ শ্রেষ্ঠ ইনিংস হল ৭১এ ম্যানচেসটারে ইংল্যানডের বিরুদ্ধে ৫৭ রান যা উনি গড়ে তুলেছিলেন এক বিধ্বংসী পিচে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে।

খেলার টেকনিক নিয়ে চুলচেরা বিচার যারা করেন তাদের চোখে গাভাসকর-বিশ্বনাথ দুজনেই স্বতন্ত্র—যেমন ছিলেন বিজয় মারচেনট এবং লালা অমরনাথ। কপিবুক ক্রিকেট খেলেন গাভাসকর। গাভাসকরের ক্রিকেটের গ্রামারে কোনও খুঁত নেই। মারার বল মারেন, ছাড়ার বল ছাড়েন। বোলারকে যেখানে সন্ত্রস্ত করা উচিত সেখানে তাই করেন, কদাচিৎ মারমুখী হয়ে বোলারকে লেংথ হারাতে বাধ্য করান।

বিশ্বনাথ অন্যরকম। গুটিগুটি মাঠে নেমে প্রথম থেকেই নিজেকে জাহির করেন চোখ জুড়ানো স্কোয়্যার কাট, লেট কাট, কভার ড্রাইভ অথবা অন সাইডে ফ্লিক করে। খুব ঝুঁকি নিয়ে খেলতে ভালবাসেন বিশ্বনাথ। সেনচুরির দোরগোড়ায় এসেও বিশ্বনাথ দমেন না। শক্ত মারাত্মক অথচ চোখ জুড়োনো মার মেরে বিশ্বনাথ মাঠশুদ্ধ সকলকে নিজের কাছে টেনে আনেন। প্রতিটি ব্যাটসম্যানের কাছেই টেসট সেনচুরি একটা অদ্ভুত আনন্দ বয়ে আনে। বিশ্বনাথ আনন্দ পান বোলারের কাছে নিজেকে অপ্রতিরোধ্য করে গড়ে তুলতে। বোলার দাবিয়ে রাখবে বিশ্বনাথের কাছে এটা অকল্পনীয়। অনেক সেনচুরি এভাবে হেলায় হারিয়েছেন বিশ্বনাথ। গাভাসকর ঠিক উলটো। ব্যাকরণ মেনে গাভাসকর খেলেন সাবধানী ছেলের মত, বিশ্বনাথ কোনও বাধা না মানা দামাল ছেলে।

একটা সময় এসেছিল, ৪০-৫০ রান করে বিশ্বনাথ তখন উইকেট থ্রো করে আসতেন। সেসময় সমালোচকরা বিশ্বনাথের 'মধ্যবিত্ত মনোভাব' নিয়ে ঝড় তুলেছিলেন। আমরা সকলেই ধরে নিয়েছি ৫০ পেরোলে গাভাসকর সেনচুরি করবেনই আর বিশ্বনাথ সেনচুরি না পেলে বিশ্বাস নেই। এইতো সেদিন ইডেনে ব্রুস ইয়ারডলির বিপজ্জনক বল স্কোয়ার ড্রাইভ

করতে গিয়ে উইকেটকীপার রাইটের হাতে উইকেটটি দিয়ে এলেন বিশ্বনাথ। সেনচুরি থেকে তখন তিনি মাত্র ৪ রান দূরে। এই ইডেনেই ৭৪-৭৫এ ৯৭ থেকে মিডল স্টাম্পের ওপর যে বলটি ফ্লিক করে ডিপ লেগে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে বিশ্বনাথ সেনচুরি করেন, সেটিও ছিল একইরকম বিপজ্জনকভাবে। মিডল স্টাম্পের বল—ফসকালে হয় বোল্ড নয়ত লেগ বিফোর উইকেট। অথচ এই ধরনের মারই মারতে ভালবাসেন বিশ্বনাথ। ক্রিকেট তার কাছে রেকর্ডের জন্য নয়, শিল্প সৃষ্টির জন্য।

উলটোটিই গাভাসকরের বৈশিষ্ট্য। গাভাসকরের কাছে ব্যাটিং একটা বিজ্ঞান, বিশ্বনাথের কাছে শিল্প। ভুল না করলে গাভাসকরের উইকেট পাওয়া খুবই দুঃসাধ্যের ব্যাপার। অমন আঁটোসাঁটো ডিফেনস ইদানিং বিশ্ব ক্রিকেটে দুর্লভ। অপরদিকে মাঠভর্তি লোককে চমৎকৃত করতে ক্রিকেটের কঠিনতম মারগুলি বিশ্বনাথের ব্যাট থেকে বার হয় এবং পতনও আসে সেইভাবে।

গাভাসকর বিশ্বনাথের মধ্যে কে বড় তার তুলনা করা বাতুলতা। একজন ওপেনার অন্যজন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। একজন দেবী প্রতিমার কাঠামো তৈরি করেন অন্যজন তাতে চাপান মাটির প্রলেপ। একজন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন অন্যজন তাতে করেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা। গাভাসকর ক্রিকেটের কারিগর, বিশ্বনাথ ক্রিকেটের শিল্পী।

গাভাসকর ও বিশ্বনাথের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপার লড়াই তাই কখনই চলতে পারে না। স্যার গ্যারি তার দশজন বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের মধ্যে গাভাসকরকে স্থান দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেই দশজনের অন্যতম ইংল্যান্ডের ডেরেক র‍্যানডালের জায়গায় বিশ্বনাথকে স্থান দিয়েছেন গাভাসকর। আর বিশ্বনাথ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় মন্তব্যটিও সম্ভবত গাভাসকরের। গাভাসকরের ভাষায় 'ভিশ জানে না ও কত বড়'। ★

কলকাতার অতিথি

সুকসদ মিহালি

সন্ধানী

'আমাদের 'বিগ ব্রাদার' রাশিয়াকে সমালোচনা করার অধিকার নেই। পঞ্চাশ দশকের স্ট্যালিনিসট পিরিয়ডেও এমনটি ছিল না। এখন হয়েছে।

'অবশ্য আত্মসমালোচনা করার অধিকার সরকার আমাদের দিয়েছেন। নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা, সরকারী আইনকানুন ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমরা মুখর হতে পারি। কাগজে আর্টিকল লিখতে পারি। গল্প-উপন্যাস ছাপতে পারি। তাতে কোন বাধা নিষেধ নেই কথাগুলো বললেন সমাজ-তান্ত্রিক হাঙ্গেরীর অল্প-তরুণ (বয়স ৪৬) প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুকসদ মিহালি।

প্রশ্ন রেখেছিলাম ওর দেশে সাহিত্যে সেনসরশিপ প্রসঙ্গে। আঁটোসাটো-চেহারা, চওড়া কাঁধ আর ঝরঝরে ইংরেজিতে সুকসদকে প্রথম দর্শনে স্পেনের কোন মেষপালক বলে মনে হতে পারে। একমাত্র গায়ের বাদামী রংটাই অবিশ্বাসের কারণ।

রিৎজ হোটেলের ৬১২ নম্বর ঘরে যাবার সময়ই রিসেপশনের লবিতে ভদ্রলোককে দেখে গিয়েছি। চোখে কাউকে খুঁজে নেবার চাউনি। ওপরে দরজা ঘণ্টার নীরব প্রত্যুত্তরে নীচে ফিরে এসে দেখি তার দৃষ্টি একটুও বদলায়নি। কাছে গিয়ে ইফ ইউ ডোনট মাইণ্ড, আর ইউ...... কথা শেষ করার আগেই আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন—'আই অ্যাম অলসো ওয়েটিং ফর ইউ।'

সুকসদ মিহালি কলকাতা এসেছিলেন এখানকার আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে, ভারতের সামাজিক সমস্যা ও প্রশ্নগুলিকে কিঞ্চিৎ নিজের চোখ আর মন দিয়ে বিশ্লেষণ করতে।

—কেমন দেখলেন?

জবাব পেলাম: এখানে আসার আগে হাঙ্গেরীর লেখকের লেখা কিছু প্রবন্ধ-টবন্ধ পড়েছিলাম। অবশ্য লেখাগুলো একটু পুরোনো। নিজের চোখে দেখলাম সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক উন্নতি করেছেন আপনারা। কিন্তু সেই সঙ্গে গরিব বড়লোকের মধ্যে ফারাকটাও বুঝি অনেক বেড়েছে। আমাদের দেশেও গরিব আছে, কিন্তু 'নো ফুড নো ক্লোথ' ব্যাপারটা অসহ্য। ভাবতে পারি না।'

—আর সাহিত্য?

বোমবে এবং দিললিতে একাধিক তরুণ কবির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তিনি। কিন্তু হিন্দি না জানার জন্যই দুধের স্বাদ ঘোলে অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমেই যেটুকু কাছে পাওয়া গেল।

সুকসদ আরও বললেন—হাঙ্গেরির শতকরা ষাটভাগ সাহিত্য রচনা হয় গ্রামকে ঘিরে, চাষী সম্প্রদায়কে নিয়ে। তিনি নিজে শহরের লোক, রাজধানী বুদাপেসটেই জন্ম, কর্ম সব। তাই গ্রাম নিয়ে 'অসত্য' রচনার ইচ্ছে তার নেই, লেখেনওনি।

চুটিয়ে লিখছেন এখন ওরকে স্টিভান নামে এক তরুণ। আধুনিক হাঙ্গেরি সাহিত্যের পয়লা সারির ব্যক্তিত্ব। অবশ্য গত বছরের বেস্ট সেলার ছিলেন মলদোভা জর্জ। তার বিশ্লেষণধর্মী রচনা 'নোটস সী হোয়াটস গোয়িং অন ইন দি হাঙ্গেরিয়ন রেলওয়েজ' কয়েক হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। রেলকর্মীদের অবস্থা, রেল ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে লেখা এই বইটি আলোড়ন এনেছে ঐ দেশে।

আর ডেরি টিবর বেঁচে থাকলে হয়ত তিনি হতে পারতেন নতুন হাঙ্গেরি সাহিত্যের জনক। সুকসদ দুঃখ করে বললেন—'বাট হি ইজ নো মোর।'

বিদেশী সাহিত্যের জন্য হাঙ্গেরির দরজা সব সময়ই খোলা। সরকারী ব্যবস্থাপনাতেই রাজধানীতে রয়েছে অনুবাদ বিভাগ। সারা পৃথিবীর বাছাই রচনার নিয়মিত অনুবাদকের টেবিলে 'হাঙ্গেরিয়ান টোসট' তৈরি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের দশটি বই এরাই অনুবাদ করেছেন আমেরিকার জন আপডাইক, সলবেলো, হেমিংওয়ে ওদেশের জনপ্রিয় লেখক। সুকসদ নিজে হেমিংওয়ে ডিকেনস, ও কাফকার ওপর তিনটি বই লিখেছেন। তিনটি উপন্যাস বেরিয়েছে তার। 'ইমপ্রিজনমেনট অফ রেমনড' সমালোচক মহলে অভিনন্দিত হয়েছে।

সাতাশটি বসন্ত বুকে নিয়ে প্রথম যে গল্প সংকলনটি (দি ল্যাডেনকেজ) সুকসদ প্রকাশ করেছিলেন তার মতে এখনও সেটি তার প্রিয় রচনা, হয়ত শ্রেষ্ঠ নয়। অন্যান্য লেখা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন: সোসাল সায়েনস এখন আমার প্রিয় বিষয়। এই বছর ঐ বিষয়ে একটি প্রবন্ধের সংকলন বেরিয়েছে আমার।

লেখার পাশাপাশি চলছে সম্পাদনার কাজ। তিনি বুদাপেসট থেকে প্রকাশিত 'রিয়্যালিটি' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সহ সম্পাদক। ভারত-ভ্রমণের এই তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু রচনা হয়ত নিজের কাগজেই লিখবেন।

কলকাতা কেমন লাগছে জানতে চাইলে বললেন 'মাত্র তিনদিন হল এসেছি। খুব একসাইটিং লাগছে এটুকু বলতে পারি।' শান্তিনিকেতন, ঠাকুরবাড়ি দেখা এখনও বাকি। কলকাতার তরুণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে মাত্র দুটি আড্ডা হয়েছে, আরও আছে।

সুকসদের একটাই দুঃখ, 'পায়ে হেঁটে শহরটাকে দেখতে পারলাম না। অসম্ভব ভিড়, তোমরা রাস্তা দিয়ে চলো কি করে?' তবুও একদিন রাত্রে কিছুক্ষণ চেষ্টা করেছিলেন চৌরঙ্গী পাড়ায়। 'বাট দি বেগিং চিলড্রেন আর ভেরি ডেনজারাস' সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছেন। বিছানায় ঢুকে বুকের ওপর তুলে নিয়েছেন 'অটোবায়োগ্রাফি অব নেহরু' বইটা। জানা গেল হাঙ্গেরিতে এক-সময় বইটা ছিল বেস্ট সেলার, এখনও। ★

চিত্রশিল্পী শ্রীমতী বেলনোস.



চিত্র-প্রদর্শনী

বিদেশিনীর তুলিতে এ দেশের জীবন

এ দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারা, বৃত্তি, আমোদ প্রমোদ, উৎসব, ধর্মীয় আচার অনুষঙ্গের এক আশ্চর্য চিত্ররূপ ধরা পড়েছিল স্বল্প কয়েকজন বিদেশিনীর তুলি কলমে। ছবিগুলি প্রায় দেড় শো বছর আগেকার। (বিশেষ চিত্র প্রদর্শনী ১৬—২৭ নভেমবর '৭৯, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়েল হল) সে যুগের ইংরেজ রাজপুরুষদের কন্যা, ভগ্নী বা জায়ার পক্ষে দেশীয় সামাজিক জীবন-চিত্রণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়েছে যা পেশাদার ইংরেজ চিত্রশিল্পীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বলা বাহুল্য সেকালে সাহেবদের যেমন কাজের অন্ত ছিল না, মেমসাহেবদের আবার ছিল তেমনই অখণ্ড অবসর। নামমাত্র বেতনে ভৃত্য নিযুক্ত করা যেত। সব সাহেববাড়িতেই ছিল ভৃত্যের ছড়াছড়ি।

মেয়েদের মধ্যে খেলাধুলোর প্রচলনও খুব একটা ছিল না। ছবি আঁকা, সেলাই করা, বই পড়া ছিল অবসর কাটাবার উপায়। এক আধটু গানের চর্চা অথবা পিয়ানো টিয়ানো কেউ কেউ বাজাত। আর ছিল 'হোম'-এ চিঠি লেখার ফ্যাশান যার জবাব পেতে বছর ঘুরে যেত।

এই অবসরের প্রত্যক্ষ ফসল হল কিছু সুপাঠ্য জার্নাল, পত্রগুচ্ছ ও সংরক্ষণযোগ্য একডালি চিত্রমালা। মেজর আর্চার-এর কন্যা ফ্যানি পার্কস কলকাতা, কানপুর, এলাহাবাদ লখনৌতে ছিলেন প্রায় নয় বছর। প্রদর্শনীতে ফ্যানির মাত্র তিন খানা চিত্র ছিল। গ্রাস কাটার, বেঙ্গলী ওম্যান ও চড়ক পূজা। উন্মুক্ত স্থানের দৃশ্যাদি চিত্রণের বিশেষ ক্ষমতা ছিল ফ্যানির। বস্তুচিত্রণ (ইলাসট্রেশন) রীতির তাৎক্ষণিক আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলিতে রেখার সূক্ষ্ম গতিবেগও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সিলুএট অথবা সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রের পাশে বিস্তৃত সাদা পটভূমির জন্যে মনে হয় এক ঝলক আলো যেন ফ্যানির ছবিকে ঘিরে আছে।

শ্রীমতী বেলনোস তার চিত্রের জন্যে রাজা রামমোহনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন। তিনি নিজেকে এদেশের মানুষ ভাবতেন। কিন্তু তার অধিকাংশ চিত্রে বিদেশী প্রভাব স্পষ্ট। এমন অনেক স্ত্রীপুরুষের প্রতিকৃতি তিনি এঁকেছেন যাদের ভারতীয় বলে ভাবা যায় না। হিন্দু নারীর আনুষ্ঠানিক স্নান ও হিন্দু নারীর স্বামীকে আহার্য পরিবেশন প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ চিত্রগুলিতে এ দেশের নারীর সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বেলনোস ফোটাতে পারেননি। 'দ্য ভিলেজ গুরু' ছবিতে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ভাব আছে। কিন্তু বেলনোস-এর সিলক কাপড়ওয়ালা, বিশেষভাবে বাঁদরওয়ালা রাস্তায় বাঁশের খুঁটির ওপর ছাগল দাঁড় করিয়ে খেলা দেখানোর রঙিন চিত্রটি অনবদ্য।

এমিলি ইডেন (গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যানডের ভগ্নী)। এ দেশে এসেছিলেন ১৮৩৬ সালে এবং ছ'বছর পরে আবার ইংল্যানডে ফিরে যান। ব্যারাকপুর থেকে সিমলা ভ্রমণকালে তিনি অসংখ্য ছবি এঁকেছিলেন। ভারতবর্ষ তার চোখে, 'কুৎসিত দৃশ্যপটে চিত্রিত জনাকীর্ণ একটি দেশ।'

অথচ পরবর্তীকালে ভারতে রেলপথ স্থাপিত হওয়ার খবরে এক আত্মীয়কে ক্ষুণ্ণমনে তার আশঙ্কার কথা লিখেছিলেন, 'কুতুব হয়তো একটা রেল স্টেশন হবে এবং তাজমহল হবে মস্ত এক হোটেল !'

প্রতিকৃতি আঁকার দিকেই তার ঝোঁক ছিল বেশি। মুঘল সৌধগুলি আঁকা তার কাছে কঠিন মনে হতো। 'দে আর অল লাইনস অ্যানড ডোমস' আঁকতে গেলে ধৈর্য হারায়।

এমিলির 'ডানসিং বয়ারস' 'লেপচাজ ফ্রম দার্জিলিং' উল্লেখযোগ্য। 'মুসলমানী' চিত্রটি এত স্বাভাবিক যে মনে হয় না কোন বিদেশিনীর আঁকা। এমিলির অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সঙ্গে মিশেছিল কৌতুক প্রবণতা। কিন্তু ছবি আঁকার চেয়েও লেখার হাত ছিল তার পাকা। ★

প্রণব নাগ

নাট্য-সমীক্ষা

অশনি সংকেত

প্রযোজনা : নট-নাট্যম। **মূলকাহিনী :** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাটক/সঙ্গীত পরিচালনা / নির্দেশনা :** জগমোহন মজুমদার। **অভিনয় রজনী :** ৬ ডিসেমবর, ১৯৭৯। শিশির মঞ্চ।

নট-নাট্যম যে কারণে পশ্চিমবঙ্গের নাট্য আন্দোলনে স্থান করে নিতে পারবেন সেটি হলো তাদের টিম ওয়ারক। এর গুণেই অশনি সংকেত একটি স্মরণীয় নাট্যকৃতি।

এমন একটা টিম ওয়ারক নিয়ে নট-নাট্যম কেন অশনি সংকেত অভিনয় করছেন সেটা অবশ্য জিজ্ঞাসার চিহ্ন হিসেবে দেখা দেয়।

বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে চিরাচরিত প্রকৃতি-মুখীনতার অভ্যাস ভেঙে প্রথম প্রকৃতি-বিরুদ্ধতার কাজ করেছিলেন। বস্তুত এ-উপন্যাস শুধু দুর্ভিক্ষের দূরাভাস নয়, ভেঙে যাওয়া বর্তমানের জন্যও হাহাকার। সেই প্রকৃতি-বিরুদ্ধতা ও হাহাকার নট-নাট্যমের প্রযোজনায় নেই। বরং এক ওপরসা ব্যঙ্গ ও অগভীর জৈবনিক আলোছায়ার কথাই এতে বলা হয়েছে। সে কারণে দর্শকদের মধ্যে বারে বারে হাসির রোল। আবার মাঝে মাঝে প্রশ্নসিদ্ধ উক্তি। যেমন দুর্গাচরণবাবু যুদ্ধ ও লোভ সম্পর্কে করেছেন, যদু পোড়া যেমন শহর থেকে কেনা পাঁউরুটি নিয়ে সারকাসের খেলা দেখিয়েছে, পণ্ডিত মশাই যেমন ভাব খাওয়ানো নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। কী বেরিয়ে এসেছে এসব সংলাপ ও অ্যাকসন থেকে ! তাছাড়া ডিপ স্টেজ ও অডিটোরিয়ামের যথেষ্ট ব্যবহারও তাকে কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেয়নি।

আশঙ্কা ছিল সত্যজিৎ রায় অশনি সংকেত চলচ্চিত্রায়িত করার পর নাটক প্রযোজনা সম্ভব কিনা। কিছু ক্ষীণ প্রভাব ছাড়া এ-নাটক সেদিক দিয়ে নট-নাট্যমের নিজস্ব। যেমন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে মিল নেই তেমনই বিভূতিভূষণের সঙ্গেও নেই। কাহিনীর কাঠামোটুকুই শুধু আছে। চরিত্রগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা এ-নাটকে আসেনি। পণ্ডিত বা তার বউ অনঙ্গ কি অত নির্দয় ? তা নয়, তাই তাদের পরিণতি অত সাংঘাতিক। পেট, একমাত্র পেটের চিন্তাই তাদের স্বর্গ হতে বিদায় দিয়েছে। এক হিসেবে যুদ্ধের সময় এরা সমস্ত মানুষের প্রতীক। দূরের এক মরণ যুদ্ধ এদের মতই সমস্ত মানবসমাজকে প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও প্রেমপ্রীতি থেকে নির্বাসিত করেছে। যেমন বিভূতিভূষণকেও করেছে।

নাট্যরূপ বাদ দিলে পরিচালনা অসাধারণ। প্রত্যেকের অভিনয়ও তাই। সে কারণেই নট-নাট্যম ও পরিচালক জগমোহনবাবুকে অনুরোধ, তারা একটি মৌলিক নাটক বেছে নিন। এত ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে তাতে আরও সার্থক প্রযোজনা সম্ভব হবে।

যীশু চৌধুরী

স্বদেশী নক্সা

প্রযোজনা : সমীক্ষণ। **নাটক :** মোহিত চট্টোপাধ্যায়। **নির্দেশনা :** পঙ্কজ মুন্সী। **সঙ্গীত :** দেবাশিস দাশগুপ্ত। **মঞ্চ :** অজয় দত্তগুপ্ত। **শব্দগ্রহণ :** হিমাদ্রি ভট্টাচার্য। **আলো :** অনেয়া। **অভিনয় :** ৫ ডিসেমবর '৭৯, সন্ধ্যা, শিশির মঞ্চ।

নাটকের শুরুতেই হিন্দুস্তা হামারা-র সুর মিলিয়ে যেতে দর্শককে টানটান করে দেয় যে ঘোড়া তার চি···হী··রবে যেন চাবুকের শব্দ ! ক্ষুরের অস্থির ছন্দে প্রভুত্ব কায়েমের রক্তধুলো ওড়ে ! ঔপনিবেশিক ইউনিয়ন জ্যাকের পতপত ছায়ায় সামন্ততান্ত্রিক শাসনের এক স্পষ্ট ছবিকে তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে। কাহিনী বললে ভুল হবে, কেননা নাটক শুরু দীর্ঘ শোষণের সূত্র ধরে, এবং আজও যার শেষ নেই। নাটকের মূল-চরিত্র নকড়ি দত্ত সামন্ত শাসকদের এক প্রতিনিধি মাত্র।

ইংরেজের কৃপাধন্য জমিদার নকড়ি দত্তের (পঙ্কজ মুন্সী) দুইপুত্র, যমজ। তারা বড়ো হয় —দুই ভাই রাম ও শ্যাম (যথাক্রমে প্রদীপ মল্লিক ও প্রদীপ দাস) পলিটিকস করে—স্বরাজ আনার রাজনীতি ! বিষয় বুদ্ধি ছল চাতুরিতে তারা টেক্কা দেয় সাত পুরুষকে। আখের গোছাতে তারা যে হাতিয়ারটি ব্যবহার করে তা ঐ রাজনীতি। নাটকে রয়েছে দুই জমিদারের প্রতিযোগিতা, সাহেব তোষণ, রাজনীতির ফয়দা লুঠতে রাম শ্যামের বিবাদ এবং ভোটরঙ্গও। স্বরাজ, যা বেনিয়া ইংরেজ ও সামন্ত প্রভুদের মধ্যে ক্ষমতার হস্তান্তর, তা ঐ এলো এলো—এই ইঙ্গিতেই নাটক শেষ। না, শেষ নয়, নাট্যকার যেন ওখানে কলম বন্ধ করে বলছেন : ভাবো। এ নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাদের সপ্রাণ দক্ষতায় সে ভাবনাটিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন।

গান এ নাটকের সম্পদ। নকড়ি দত্তের গাওয়া 'ও গাদার মেরী' তো অনেকদিন মনে থাকবে।

শেষ দৃশ্যে আবার সেই ঘোড়ার দুরন্ত আবির্ভাব, ক্ষমতা মুঠোয় নিতে দুভাইয়ের জীবনপণ প্রতিযোগিতা, ক্ষুধার্ত মানুষের সারি সারি ভিক্ষার হাত, আর আলো, ধ্বনি মিলিয়ে মিশিয়ে এক অসামান্য অডিও-ভিস্যুয়াল এফেকট। একটু কৌতূহলী প্রশ্ন মনে জাগছে : মুখোশ পরে একটি সাদা ঘোড়াকে প্রাণবন্ত করলেন যারা, তাদের নাম স্মারক পুস্তিকায় নেই কেন ?

ত্রুটি ? আমার চোখে একটিই। নাটকের ঘটনা মোটামুটিভাবে যখনকার, তখন এদেশ সাগর পারের রাজার অধীন। কিন্তু দেওয়ালে আঁটা মানচিত্রে তখনই 'ভারত মাতা' দ্বিখণ্ডিতা। কেন ?

মৃদুল দাশগুপ্ত

মুদ্রক ও প্রকাশক : অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিন্টার্স. ৭৭/২/১, লেনিন সরণি কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯ থেকে প্রকাশিত


পরিবর্তন

PARIBARTAN, 1 January 1980 Registration No. 32815/78 Postal Registration No. WB/CC—3



আলোকচিত্র ঃ অমিয় তরফদার